লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

আহ্‌মদী বুলেটিন

৩১ জানুয়ারি-১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ ঈসাব্দ

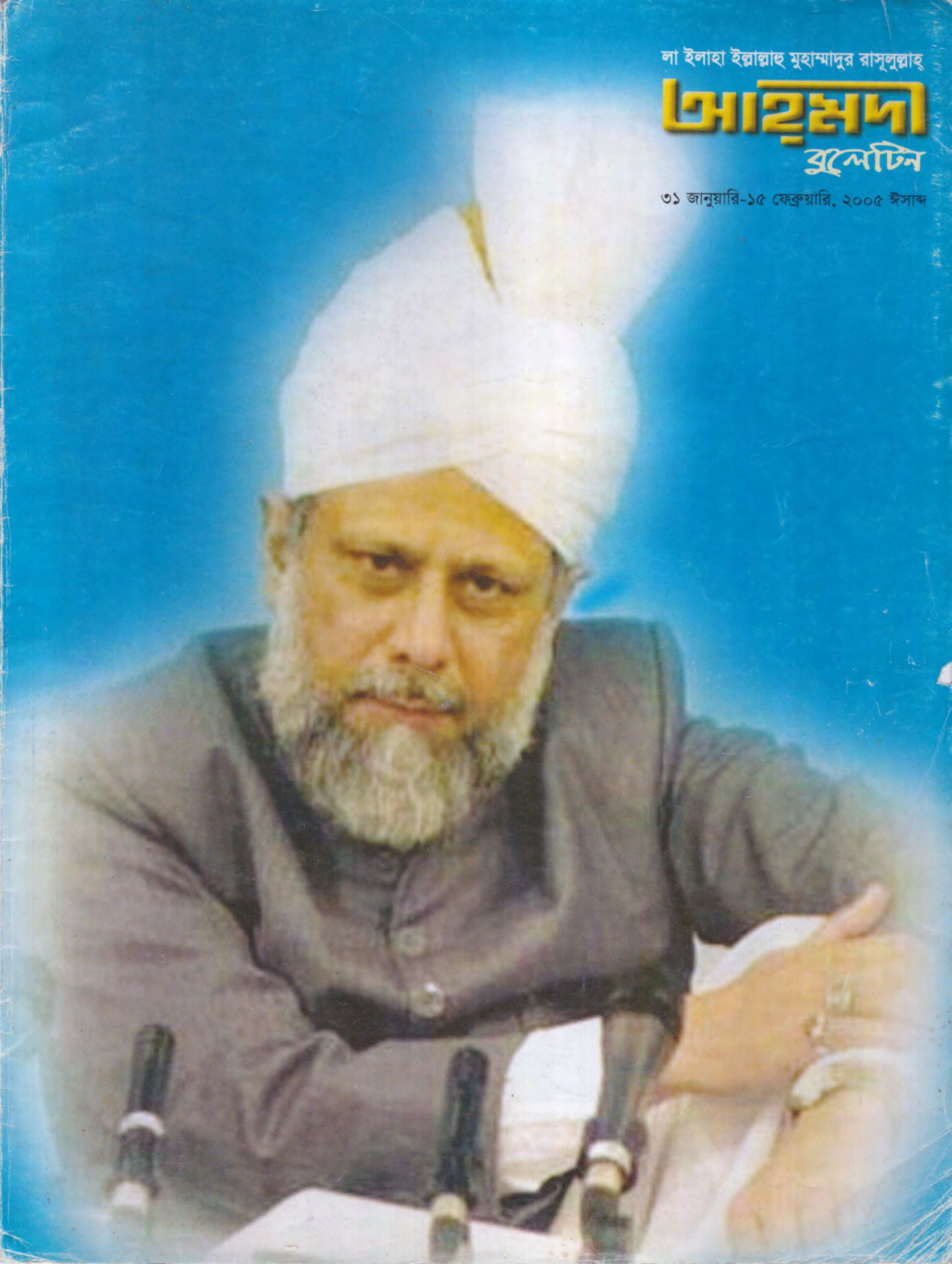

দারুল আমান কাদিয়ানের ১১৩ তম জলসা ২০০৪-এ বক্তব্য রাখছেন মোহতরম মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব, নাযেরে আলা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৮০তম জলসা সালানায় বক্তব্য রাখছেন হুজুর (আইঃ) এর প্রতিনিধি মোহতরম নওয়াব মনসুর আহমদ সাহেব

সম্পাদকীয়

স্বাগতম জলসা সালানা

মহান আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) আহমদীয়া মুসলিম জামাতে জলসা সালানার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ঐতিহাসিক শুভারম্ভের প্রেক্ষিতে বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে উদ্‌যাপিত হয় জলসা সালানা। কাদিয়ানের গন্ড গ্রাম থেকে যে জলসা শুরু হয়েছিল, তা আজ পরিগ্রহ করেছে আন্তর্জাতিক রূপ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জলসার কল্যাণরাজি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন- "এর কিছু কল্যাণ ভবিষ্যতেও প্রকাশ পাবে।" আমরা আজকে এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে সরাসরি জলসার কার্যক্রম দেখতে পাচ্ছি এবং তা থেকে রূহানী ফায়েয লাভে সক্ষম হচ্ছি। জলসার সময়কালীন সময়ে ইবাদতের এক অপূর্ব দিক দৃশ্যমান হয়। জলসা নবীন প্রবীণ আহমদীদের এবং নবাগতদের এক আধ্যাত্মিক মিলন মেলায় পরিণত হয়। বিয়ে-শাদী, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি ও একে অপরের ইমানোদ্দীপক ঘটনাবলী শোনার মাধ্যমে এবং বুযূর্গদের জ্ঞান সমৃদ্ধ বক্তব্য শ্রবণে আমাদের ঈমান সতেজ হয়। বাংলাদেশেও এই জলসা প্রবর্তন হয়েছে বহু আগে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উপর নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ হওয়ায় এই জলসার গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই–বিরোধিতা বাড়লে প্রচার ও প্রসার বাড়ে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) বলেন- "বিপদ দেখে সম্মুখে অগ্রসর হবে।" বাংলাদেশের এই জলসায় আগমনকারী প্রত্যেককে নিজেদের আমল ও দোয়ার মাধ্যমে এদেশের জামাতকে এগিয়ে নিতে হবে। আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) দোয়া করেন– "যারা এ লিল্লাহি জলসার উদ্দেশ্যে সফর করেন, খোদা তাদের সহায় হোন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের উপর দয়াপরবশ হোন, তাদের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান, সকল দুঃখ-কষ্ট হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ কামনা ও কার্য সিদ্ধির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন এবং হাশরের দিন তাদেরকে খোদা তাঁর সেই সকল বান্দাদের সঙ্গে উত্থিত করুন যাদের উপর তাঁর ফযল ও রহমত বর্ষিত হয়েছে এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন।

হে খোদা! হে মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াবান ও সমস্যা সমাধানকারী খোদা! এ সব দোয়াই তুমি কবুল কর এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে প্রাধান্য দান কর, কেননা সকল শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী একমাত্র তুমিই; আমীন, সুম্মা আমীন।" (বিজ্ঞাপন ঃ ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯২ইং)।

□ ৩১ জানুয়ারি-১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
• কুরআন শরীফ	৪
• হাদিস শরীফ	৫
• অমৃত বাণী	৬
• হুযূর (আইঃ)-এর বাণী	৭
• ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বাণী	৮
• জুমুআর খুতবা ঃ জলসায় যোগদানকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	৯-১৩
• জুমুআর খুতবা ঃ তোমরা যতশীঘ্র সম্ভব তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইদেরকে ক্ষমা কর। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আইঃ)	১৪-১৯
• জুমুআর খুতবা ঃ জামাতের কর্মকর্তা এবং সাধারণ সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	২০-২৭
• ঐশী বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)	২৮
• প্রথম ইউরোপীয় আহমদী মিশনারী অনুবাদ ঃ সিকদার তাহের আহমদ	২৯-৩১
• ঐতিহাসিক খেলাফত জুবিলী জলসা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	৩২-৩৭
• আহমদীয়াত ঃ ইয়ানী হাকীকী ইসলাম মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	৩৮-৩৯
• ফ্ল্যাশ ব্যাক ঃ জলসা সালানা মোহাম্মদ জাকির হোসেন	৪০-৪৩
• আর্ত মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়	৪৪-৪৬
• জাগ্রত বিবেকের প্রতিধ্বনি সিবগাতুর রহমান মুকুল	৪৭-৪৮
• এ্যালবাম	৪৯-৫০
• হাইকোর্টের রায়	৫১
• সাম্প্রতিককালে জামাতে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলন	৫২-৫৫
• ধৈর্য্য ও সাহসিকতা হাশেম উল্লাহ্ সিকদার	৫৬-৫৮
• মহানবী (সঃ)-এর ভেষজ চিকিৎসা ঃ মারিয়া হোসেন	৫৯
• এম. টি. এ. ডাইজেষ্ট ঃ ডক্টর আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক	৬০
• শেখ জোনাব আলী সাহেব স্মরণে মোহাম্মদ আব্দুল আজীজ	৬১-৬২

প্রচ্ছদ ঃ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)

সূরা আত্ তাওবা-৯

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ
اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ
عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আল্লাহ্ তোমাদের হাত তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন, আর (এভাবে) তিনি মু'মিনের মনে স্বস্তি প্রদান করবেন,

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৫। এবং তিনি তাদের হৃদয়ের ক্রোধকে দূর করে দেবেন; আর আল্লাহ্ যাকে চাইবেন তার তওবা গ্রহণ করে অনুগ্রহ করবেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا
مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَ
لَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। তোমরা কি (পরীক্ষা ছাড়াই) তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে বলে ভেবেছ, অথচ তোমাদের মাঝে যারা জেহাদ করেছে এবং আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনদেরকে ছাড়া কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি। আল্লাহ্ তাদেরকে এখনও পৃথক করে দেখাননি?১১৬৭ এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ
عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۖ وَ
فِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। আল্লাহ্র মসজিদগুলোকে আবাদ করা মুশরিকদের কাজ নয় যেক্ষেত্রে তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে কুফরীর১১৬৮ সাক্ষ্য দিচ্ছে। এদেরই কাজকর্ম ব্যর্থ এবং এরা দীর্ঘকাল আগুনে পড়ে থাকবে।

১১৬৭। এ আয়াত ইঙ্গিত করে যে, মুসলমানদের পরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি। আরো ভয়ানক বিপদাবলী তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

১১৬৮। এ আয়াত পৌত্তলিক তীর্থযাত্রী সম্পর্কিত এবং ৯ঃ২৮ আয়াতে উল্লেখিত ঘোষণার ভূমিকাস্বরূপ। তখন থেকে কোন পৌত্তলিকের জন্য কা'বা ঘরের নিকটবর্তী হওয়ার অনুমতি ছিল না, যেমন হযরত আলী (রাঃ) নবম হিজরী সনে প্রথম হজের বা হজে আকবরের দিনে মক্কায় সমবেত হজযাত্রীদের নিকট ঘোষণা করেছিলেন। তফসীরাধীন আয়াত উক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ ব্যক্ত করেছে। উপাসনালয় হিসাবে কা'বা এক আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। অতএব, পৌত্তলিকদের এতে কিছুই করণীয় ছিল না। তারা আল্লাহ্তাআলার তৌহীদের দুশমন এবং নিজেদের স্বীকারোক্তি মতেই তারা নিন্দিত অপরাধী।

হাদীস শরীফ

জলসায় যোগদানের কল্যাণ

وفي روايةٍ لمسلِمٍ عَنْ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ :
« إنَّ لِلّهِ مَلائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَتَتَبَّعُون مَجَالِسَ الذِّكرِ ، فَإذَا وجَدُوا مَجلِساً فيهِ ذِكْرٌ ، قَعَدُوا مَعَهُم ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلُؤوا ما بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدوا إلى السَّمَاءِ ، فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَهُوَ أَعْلَمُ ـ : مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ : يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيُهَلِّلُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيَسْأَلُونَكَ. قالَ : وَمَاذَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالُوا : يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ . قالَ : وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ قالُوا : لا ، أَيْ رَبِّ : قالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ ! قالُوا : وَيَسْتَجِيرُونَكَ . قال : وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونِي ؟ قالوا : مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ . قالَ : وَهَلْ رَأَوْا نَارِي ؟ قالوا : لا ، قال : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي ؟ ! قالُوا : وَيَسْتَغْفِرُونَكَ ، فَيقول : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، وَأَعْطَيْتُهُمْ ما سَأَلُوا ، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا . قَال : فَيَقُولونَ : ربِّ فيهِمْ فُلانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إنَّمَا مَرَّ ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ ، فيقولُ : ولَهُ غَفَرْتُ ، هُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ »

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ্তাআলার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্ যিক্র করা হয়। অতএব যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান যেখানে (আল্লাহ্র) যিক্র হতে থাকে, তাঁরা তাদের সাথে বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তারা একে অপরকে আবৃত করেন। এমনকি তাদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। (টীকা ঃ এই রকম মসজিদের উপর যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে থাকেন তা-ই রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন। একে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না)। অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস হতে উঠে যায় তখন ফিরিশ্তাগণও আকাশে চলে যায়। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি তাদের অপেক্ষা বেশি জানেন, তাদিগকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কোথা হতে এসেছ?' তখন তারা উত্তর দেন, 'আমরা তোমারই সেবব বান্দার নিকট হতে এসেছি, যারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট প্রার্থনা করছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করছিল? ফিরিশ্তাগণ বলেন, 'তারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত প্রার্থনা করছিল'। আল্লাহ্ পুনঃ প্রশ্ন করেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? ফিরিশ্তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু! না তারা দেখে নেই। তিনি বলেন, 'কী অবস্থা হ'ত যদি তারা আমার জান্নাত দেখত!' তারা বলেন,তারা তোমার নিকট তোমার আশ্রয়ও প্রার্থনা করছিল।' তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা কি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছিলো?' ফিরিশ্তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু! তারা (দোযখের) আগুন হতে আশ্রয় চেয়েছিল। তিনি বলেন, 'তারা কি আমার আগুন দেখেছে? 'তাদের কি অবস্থা হত যদি তারা আমার আগুন দেখত?' তখন তারা বলেন, তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।' তারা আমার কাছে যা প্রার্থনা করেছে তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা হতে আশ্রয় চেয়েছিল তাদেরকে আশ্রয় দিলাম'। তখন তারা বলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে অমুক তো অত্যন্ত গুনাহগার বান্দা ছিল যে সেই জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সে তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল।' তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা তারাতো সে সব আশিসপ্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সে-ও বঞ্চিত হবে না।" (মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্র)।

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

সালানা জলসায় আগমনের গুরুত্ব

বিজ্ঞপ্তি

"এই অধমের নিকট বয়আতপূর্বক এ জামাতের প্রবেশকারী সকল নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গের জেনে রাখা দরকার যে, বয়আত করার উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ যেন নিবারিত হয় আর স্বীয় মহান প্রভু এবং রসূলে মকবুল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভালবাসা প্রাণে সমুন্নত থাকে। আর সংসার বর্জনের অবস্থা এরূপ হয়ে যায় যদ্বারা আখেরাতের সফর যেন দুর্বিসহ মনে না হয়; কিন্তু এ উদ্দেশ্য লাভের জন্যে পুণ্য সংস্পর্শে থাকা ও জীবনের এক অংশ এ পথে ব্যয় করা আবশ্যক। যদি খোদাতাআলা চান, তাহলে কোন নিশ্চিত দলীল প্রত্যক্ষ করার ফলে যেন শক্তিহীনতা ও দুর্বলতা ও আলস্য দূরীভূত হয় এবং দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবার পরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং ভালবাসার আবেগ সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয়ে সর্বদা চিন্তায় থাকা উচিত এবং এমনভাবে চিন্তা করা উচিত যেন খোদাতাআলা এর সৌভাগ্য দান করেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর সৌভাগ্য না হয়, কখনও কখনও অবশ্যই সাক্ষাত লাভ হওয়া উচিত। কেননা, বয়আত গ্রহণের পর সাক্ষাত লাভের কোন পরওয়া না করা এমনই এক বয়আত গ্রহণ যাতে কোন কল্যাণ নেই এবং ইহা নিছক আনুষ্ঠানিক বয়আতের অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু প্রত্যেকের জন্যে মনের দুর্বলতা বা অক্ষমতা বা সফরের দূরত্বের কারণে এরূপ সুযোগ হতে পারে না যে, সে আমার সংস্পর্শে এসে থাকে বা বৎসরে কয়েকবার কষ্ট করে সাক্ষাতের জন্যে এখানে আসে। কেননা, অধিকাংশ হৃদয়ে এখনও এতটা উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত হয়নি যে, সাক্ষাতের জন্য বড় বড় দুঃখ ও বড় বড় বাধা-বিপত্তিকে সহ্য করতে পারে। এ কারণে অবস্থাদৃষ্টে উপলব্ধি করা যায় যে, বছরে এরূপ ৩ দিন ব্যাপী জলসার আয়োজন করা হোক যার মধ্যে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ, যদি আল্লাহ্ চান, সুস্থ থাকেন, অবকাশ পান, এবং কঠিন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহলে যেন তারা নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হয়ে যান।

সুতরাং আমার মতে উত্তম ইহাই যে, ঐ তারিখ যেন ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ অমুকের পরে যা কিনা ৩০শে ডিসেম্বর ১৮৯১ এর পরে আগামীতে আমাদের জীবনে ২৮শে ডিসেম্বর তারিখ যখন আসে যতটুকু সম্ভব সকল বন্ধুকে কেবল রাব্বানী কথাবার্তা শুনার জন্য দোয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্যে ঐ তারিখে এখানে এসে উপস্থিত হওয়া উচিত। আর এ জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্ব-জ্ঞানে ভরপুর কথাবার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকবে- যা ঈমান, প্রতীতি ও তত্ত্ব-জ্ঞানে বুৎপত্তি দানের জন্যে আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্ম বিশেষ দোয়া, এবং বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে যেন খোদাতাআলা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। আর তিনি গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন। আর এসব জলসায় একটি সাময়িক কল্যাণ তাদের ইহাও লাভ হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামাতে দাখেল হবেন তারা ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন এবং পরিচিত হয়ে পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধন ও পরিচিতি বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন এ জলসায় তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা হবে। আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার জন্যে এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ কাঠিন্য, অপরিচিতি ও কপটতা দূরীভূত করার জন্যে মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে চেষ্টা করা হবে। এছাড়াও বহু আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে যা ইনশাল্লাহুলকাদীর সময়ে-সময়ে প্রকাশিত হতে থাকবে। কম আয়ের লোকদের জন্যে উচিত হবে যেন তারা পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ খরচের জন্যে প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক রেখে দেন তাহলে সময় মত পথ খরচের টাকার সংকুলান হয়ে যাবে। মোটকথা, এ পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে। উত্তম ইহাই হবে যে, যেসব বন্ধু এ প্রস্তাবে রাজী হবেন তারা লিখিতভাবে বিশেষ করে আমাকে জানাবেন যেন আলাদা তালিকায় তাদের নাম তালিকাভুক্ত হয়ে সংরক্ষিত থাকে। তারা শক্তি ও সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হওয়ার জন্যে নিজের ভবিষ্যত জীবনের জন্যে যেন অঙ্গীকার করে নেয় এবং জীবনের বিনিময়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে উপস্থিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় কেবল ব্যতিক্রম হবে যে, যদি এমন প্রতিবন্ধকতা এসে যায় যাতে সফর করা সাধ্যের বাইরে চলে যায়। আর এখন ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ধর্মীয় পরামর্শের জন্যে জলসা করা হয়েছে। এ জলসায় যে সব বন্ধু কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে সফরের কষ্ট সহ্য করে এসেছেন খোদা তাদের উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ্‌তাআলা পুণ্য দান করুন। আমীন সুম্মা আমীন।"

বাণী

বাংলাদেশ জামাতের প্রিয় বন্ধুগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আল্‌হামদুলিল্লাহ! প্রতিকূল ও কঠিন সময়ে আপনারা আপনাদের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন। আল্লাহ্‌তাআলাও আধ্যাত্মিক জলসায় আপনাদের সমাগম সকল দিক থেকে কল্যাণ ও আশীষমন্ডিত করুন এবং এই জলসা আপনাদের মাঝে সব রকম নেক ও পবিত্র পরিবর্তনের মাধ্যম হোক। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের সকলকে নিজ সুরক্ষার ছায়াতলে আশ্রিত রাখুন। আমীন।

আল্লাহ্‌র অদ্ভুদ শক্তি প্রদর্শনের খাতিরে বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী থাকারও দরকার আছে। তাই ঐশী জামাতের উপর পর্যায়ক্রমে পরীক্ষার অবস্থাও এসে থাকে। তাই, মু'মিন কখনো কখনো অর্থ, প্রাণ, সন্তান-সন্ততি ও ফসলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো বিপদ ও পরীক্ষা ঈমানের শর্তবিশেষ। এছাড়া ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না এবং পরীক্ষা ছাড়া কোন বড় আশীষ লাভ করা সম্ভব নয়। জগতেও সাধারণভাবে এ নিয়মই চলে যে, জাগতিক ভোগসামগ্রী ও কল্যাণরাজি লাভের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা অতিক্রম করতে হয় তবেই সাফল্যের মুখ দেখা যায়। এর পরেও এটা আল্লাহ্‌র আশীষের উপর নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে খোদাতাআলার মত অতুলনীয় নেয়ামত পরীক্ষা ছাড়া কিভাবে পাওয়া সম্ভব" (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং প্রত্যেক নবী ও তাঁর জামাতের উপর বিপদ ও কাঠিন্যের যুগ এসেছে। আঁ-হুযূর (সঃ) ও তাঁর সাহেবগণকে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ-কষ্ট দেয়া হয়েছে। রসূল পাক (সঃ)-এর ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাঁর ওপর আবর্জনা ফেলা হয়েছে, গলা টিপে (মেরে ফেলার) চেষ্টা করা হয়েছে। সাহাবীগণকে নির্দয়ভাবে মারপিট ও শহীদ করা হয়েছে। কিন্তু আঁ -হযরত (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ আল্লাহ্‌র জন্যে প্রত্যেক দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করেছেন এবং প্রত্যেক বিপদের সময়ে নিজ প্রভু ও অভিভাবকের সামনে সদা বিনত ছিলেন। সবসময় এই আবেদনই করেছেন-ইন্নামা আশকু বাস্‌সি ও হুযনি ইলাল্লাহি" অর্থাৎ আমি আমার সকল দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ্‌র সমীপে নিবেদন করি। আপনারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রকৃত দাস হযরত মসীহ্ মাওউদ

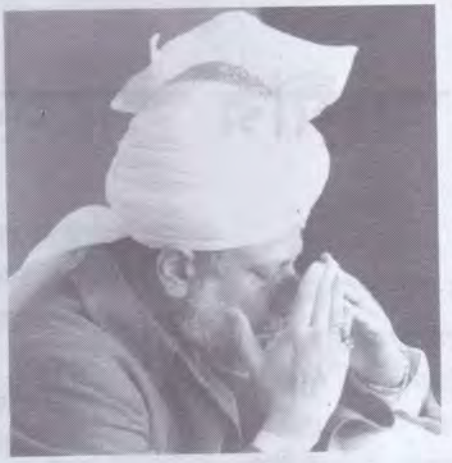

(আঃ)-কে মান্যকারী তাই আপনাদের উপরও পরীক্ষা আসা আবশ্যক। আপনাদের এই পরীক্ষার সময়ে আপনাদের প্রতি আমার একই পয়গাম যা কুরআন করীম চৌদ্দশ' বছর পূর্বে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মান্যকারীদের দিয়েছিল-'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুস্‌তাঈনু বিস্‌সাবরি ওয়াস্‌ সালাত" হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ধৈর্য্য ও দোয়ার মাধ্যমে (আল্লাহ্‌র) সাহায্য কামনা কর। তাই খোদার আঁচল ধরুন, নিজ সিজদার জায়গাকে ভিজিয়ে দিন আর মনে রাখবেন খোদার প্রতি বিনত লোকদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়। যারা খোদার আঁচল ধরে থাকেন তারা কখনো বিফল ও অকৃতকার্য হয় না। খোদাতাআলা যার সাহায্যকারী ও বন্ধু হন সারা পৃথিবী যদি তার শত্রু হয়ে যায় তবুও কোন পরওয়া নেই। খোদার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক থাকলে পৃথিবী তার কোন ক্ষতিই করতে পারে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বয়আতের এ-ও একটি শর্ত রেখেছেন, "সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সব অবস্থায় খোদাতাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সব অবস্থায় তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সব অবস্থায় তাঁর মীমাংসা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাৎপদ হবে না বরং সামনে এগিয়ে যাবে।" সুতরাং এই কষ্টের সময়ে আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হয়ে সামনে এগিয়ে যান আর নিজ ইবাদতকে আগের তুলনায় বাড়িয়ে দিন। রাতে উঠে নিজ প্রভুর সমীপে কান্নাকাটি করুন। কেননা, তিনিই সব ধরনের সম্মান দেন এবং সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করে থাকেন।

"শত্রু যখন হৈচৈ-য়ে বেড়ে গেলো
তখন আমি গুপ্ত বন্ধুর মাঝে লুকিয়ে গেলাম।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"তোমরা এখন খোদাতাআলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিলসিলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছ তাই এটা আবশ্যক যে, তোমাদেরকে দুঃখ দেয়া হয়, কষ্ট দেয়া হয়, তোমাদের গাল-মন্দ শুনতে হয় আর জাতি ও গোষ্ঠী হতে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। কিন্তু তোমরা যদি এ সব কষ্ট, বিপদ ও ক্ষতিকারক বস্তুকে খোদা বলে গণ্য না কর বরং আল্লাহ্‌তাআলাকে খোদা মান্য করে থাক তবে এসব কষ্টকে সহ্য করতে প্রস্তুত থাকো। আর প্রতিটি বিপদ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা কর। আল্লাহ্‌তাআলার নিকট শক্তি ও সাহায্য চাও। তাহলে আমি তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে বলছি, তোমরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে খোদাতাআলার মত মহান নেয়ামতকে লাভ করবে এবং সব বিপদ আপদের উপর জয়যুক্ত হয়ে দারুল আমানে (অর্থাৎ– নিরাপদ আবাসে) প্রবেশ করবে।" (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)।

অতএব এ পরীক্ষার সময়ে খোদাতাআলার দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করুন এবং খোদাতাআলার সূক্ষ্ম পথের দিকে লক্ষ্য রাখুন। নিজেদের অন্তরে বিনয় ও নিষ্ঠা সৃষ্টি করুন। খোদাতাআলার নিকট থেকে শক্তি ও সাহস চান। তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং তাঁর প্রতাপকে নিজের দৃষ্টির সামনে রাখুন। আল্লাহ্‌তাআলা এ প্রিয় জামাতকে কখনো বিনষ্ট করবেন না। তিনি একে অনেক বিস্তৃতি দান করবেন এবং হাজারো সত্যবাদীদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ্। বিপদ ও পরীক্ষার সময় পূর্ণ হেদায়াতদাতা হযরত আকদাস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি খুব বেশি করে দুরূদ প্রেরণ করাও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ যুগে বিজয় লাভ করতে হলে এবং বিপদ ও পরীক্ষার সময়কে কৃতকার্য ও সফলতার সাথে অতিক্রম করতে হলে বাংলাদেশের পরিবেশকে দুরূদ শরীফ দিয়ে ভরে দিন। প্রত্যেক আহমদী যেন খুব দুরূদ শরীফ পাঠ করে। **আপনাদের যদি ইসলামী কল্যাণের প্রতীক হতে হয় তবে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ প্রেরণ করতে হবে।** আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের সবাইকে আমার নসীহতের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হোন। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হোন এবং নিজ সুরক্ষার ছায়ায় স্থান দিন।

ওয়াস্‌সালাম
খাকসার
মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বাণী

বাংলাদেশ জামাতের ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

বর্তমান সময়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। যুলুম, নির্যাতন আর সবদিক দিয়ে বিরোধিতা যেমন প্রবল আকার ধারণ করছে, তেমনি অন্যদিকে দেশের বিবেকবান প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীরা মানবাধিকার রক্ষায় আকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে আসছেন। এহেন প্রেক্ষাপটে যুগের খলীফা (আইঃ)-এর দোয়ার অংশীদার হয়েছে বাংলাদেশ জামাত। সারা বিশ্বের-বিশেষভাবে আহমদীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে আমাদের দেশটির উপর। সত্যের বিরোধিতা হওয়াও জরুরী। এটি আল্লাহ্‌তাআলারই বিধান। এ পরিস্থিতিতে আমাদের প্রত্যেককে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে– সেই সাথে আমলের ময়দানে উত্তম নমুনা পেশ করতে হবে। মনে রাখতে হবে কুরআনের সেই অমোঘ বাণী–**নাসরুু মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারিব।" নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী।** আমাদের উপর যত বিরোধিতা হবে ততই আমাদের খোদাতাআলার প্রতি ঝুঁকতে হবে। আমরা যেন কখনও আমাদের আদর্শ হতে বিচ্যুত না হই। যুগ যুগ ধরে এটাই খোদাতাআলার রীতি যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটান। সর্বাবস্থায় এক আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদেরকে প্রণত হয়ে থাকতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কিশতিয়ে নূহ পুস্তিকায় বলেন-

"সেই উৎসের পিয়াসী হও, তবে তা আপনি তোমাদের নিকট আগমন করবে। সেই দুগ্ধের জন্য তোমরা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন কর যেন, দুগ্ধ স্বতঃই স্তন হতে নির্গত হয়ে আসে। তোমরা দয়ার যোগ্য পাত্র হও, তবে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।

উদ্বিগ্ন হও, সান্তনা পাবে। পুন পুন ক্রন্দন কর যেন ঐশী স্নেহ-স্পর্শ এসে তোমাদের সান্তনা দেয়।"

জামাতের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালবাসাপূর্ণ আচরণ যেন আমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনে রাখতে হবে ইবাদতের দু'টি ধারা রয়েছে। একটি ধারা আল্লাহ্‌র হক আদায় করা অন্য ধারাটি বান্দার হক আদায়ের। স্রষ্টার প্রতি ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং সীমাতিক্রম আমাদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের দুর্বলতার সুযোগে শয়তান বাসা বাঁধে আমাদের শিরা-উপশিরায়। এথেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ তওবা ও ইস্তিগফার। বর্তমান বিশ্বের সংকট থেকে উত্তরণেরও একমাত্র পথ সামগ্রিকভাবে তওবা করা। মহান আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন, **"এবং আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন এমতাবস্থায় যে, তুমি তাদের মধ্যে রয়েছ এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন"** (৮ঃ৩৪)। এ আয়াত থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, যতক্ষণ না আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপর আযাব আসতেই পারে না। অন্যদিকে যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে তওবা করি বা ক্ষমা প্রার্থনা করি ও সেভাবে প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনা করি তাহলেও বর্তমান এই দুর্ভোগ থেকে মুসলিম সমাজ তথা সারা বিশ্ব বাঁচতে পারে। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন যুগের ইমামকে চেনা ও তাঁকে পূর্ণভাবে আনুগত্য করা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন–**"আমি খোদার হাতে রোপিত এক বৃক্ষ। কোন মানুষের সাধ্য নেই যে, সে এ বৃক্ষকে উৎপাটন করে।"** আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা এই সত্যকে উপলব্ধি করতে আমাদেরকে সাহায্য করে। যতবারই বিরোধিতা করেছে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ততবারই আরো দ্বিগুণ এমনকি অগণিত ধারায় সাফল্যের মুখ দেখেছে। মহান আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের দেশবাসীকে তাড়াতাড়ি এ সত্য বুঝার ও তা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার

(মোবাশ্‌শের উর রহমান)
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

জলসায় যোগদানকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাস্‌রূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ২৫ জুলাই, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র বড় ফযল এবং কৃপা যে, আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত গ্রেট ব্রিটেনের ৩৭তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ করুন, এ জলসা যেন পূর্বের মতই আজ থেকে একশ' বার বছর পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেমন কাদিয়ানে জলসা আরম্ভ করেছিলেন তেমনই ঐতিহ্যবাহী হয়। আল্লাহ্‌র নামে অনুষ্ঠিত এ জলসা অন্যান্য পার্থিব মেলা বা রং তামাশার মত নয়। এ জলসা অত্যন্ত পবিত্র নিয়্যতে এবং মূল্যবান ফলপ্রসূ জলসা। অতি সামান্য এ ভূমিকার পর আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি যেখানে হযরত (আঃ) এ জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এবং জলসা করা ও এতে শামিল হওয়ার জন্যও বলেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"এ জলসা এমন তো নয় যে, জাগতিক মেলার মত অযথা এর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিতেই হবে। বরং এ জলসা অত্যন্ত পবিত্র নিয়্যত ও মূল্যবান ফলাফল বহনকারী হতে হবে।" "এ জলসা কোন জাগতিক রং তামাসার জন্য নয়" (মজ্‌মুআ ইশতেহারাত; ১ম খন্ড; পৃঃ ৪৪০-৪৪৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"[ইমাম হযরত (আঃ)-এর] বয়াতের ধারাবাহিক বন্ধনের মাঝে প্রবেশ করার পর বয়াতকারী ব্যক্তির তাঁর সাথে বার বার মূলাকাৎ করা (সাক্ষাৎ) উচিত; কোন বয়াতকারী যদি বার বার ইমামের সাথে মুলাকাতের আগ্রহ না রাখে তাহলে তার বয়াত বরকত বিবর্জিত, সারশূন্য ও কেবল রীতিমাত্র। সর্বা সাধারণের জন্য, প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে, অথবা শক্তি-সামর্থ্য না থাকার কারণে, অথবা সফরের দূরত্বের কারণে এখানে এসে যথেষ্ট সময় ইমামের সাথে থাকার অথবা বছরে একাধিকবার কষ্ট করে এখানে এসে ইমামের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হয় না। অধিকাংশ মানুষের অন্তরে

এত বেশি আগ্রহ বা উৎসাহও থাকে না যে, তারা মুলাকাতের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে অনেক বড় ক্ষয়-ক্ষতি নিজের উপর আরোপ করে এখানে আসবে। এসব কারণে বছরে একবার তিন দিনের জন্য এখানে এমন জলসা অনুষ্ঠান করা সমীচীন মনে হয়েছে যাতে জামাতের সকল আহমদী যারা আন্তরিকতা রাখে, যদি আল্লাহ্ চাহেন, স্বাস্থ্য ও সুযোগ-সুবিধা যাদের আছে তারা সময়মত নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে উপস্থিত হবেন" [মজমুআ ইশতেহারাত; ১ম খন্ড; পৃঃ ৩০২]।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

"যতদূর সম্ভব, সাধ্যমত চেষ্টা করে, বন্ধুদের কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে, তরবিয়তী কথাবার্তা শোনার উদ্দেশ্যে এবং দোয়ায় শামিল হবার জন্য নির্ধারিত তারিখে এখানে চলে আসা উচিত। এ জলসায় এমনসব মূল্যবান হকীকত ও মা'রেফাতের কথা শোনানো হবে যা ঈমান, ইয়াকীন এবং মা'রেফতকে বাড়ানোর জন্য আবশ্যক। তাছাড়া এসব বন্ধুর জন্য দোয়াও করা হবে, বিশেষ মনোযোগ সহকারে দোয়া করা হবে। আরহামুর রাহেমীন (সবচেয়ে বড় দয়ালু)-এর দরবারে চেষ্টা করা হবে আল্লাহ্ যেন এদেরকে নিজের কাছে টেনে নেন এবং এদেরকে নিজ বান্দা হিসেবে কবুল করেন এবং এদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। একটি সাময়িক উপকার এটাও তারা লাভ করবেন যে, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামাতে শামিল হয়েছেন নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের সাথে দেখা করবেন। তাদের মুখ দেখে নিবেন, পরিচিত হবেন এবং পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উন্নতি হয়ে ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ... এ আধ্যাত্মিক জলসায় আরো অনেক রূহানী উপকার লাভ হবে যা ইনশাআল্লাহুল কাদীর সময়ে সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে" [ইশতেহার, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ইং রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খন্ড; পৃঃ ৩৫২]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন ঃ

"এ জলসার নিশ্চয় আরো কিছু বরকতময় উদ্দেশ্য থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে যাতায়াত খরচ ইত্যাদি বহন করার সামর্থ্য রাখে সে যেন অবশ্যই এ জলসায় আসে এবং শীতের বিছানা, লেপ বা কম্বল ইত্যাদি যা যা প্রয়োজনীয় তা যেন সঙ্গে নিয়ে আসে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের রাস্তায় ছোট ছোট বাধা-বিপত্তিকে যেন গুরুত্ব না দেয়" [ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২ইং মজমুআ ইশতেহার; ১ম খন্ড; পৃঃ ৩৪১]

হুযূর (আঃ) বলেছেন ঃ

"... যাদের (আর্থিক) সংগতি স্বল্প তাদের জন্য সমীচীন হবে তারা যেন অনেক আগ থেকেই জলসায় উপস্থিত হবার জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও মিতব্যয়িতা বা কম খরচ করে করে সামান্য সামান্য টাকা যেন প্রতিদিন বা প্রতিমাসে জমাতে থাকে। পৃথক করে রাখতে থাকে যেন যথাসময়ে টাকার সমস্যা না হয় এবং এ সফর যেন বিনা খরচেই সফল হয়ে যায়" (মজ্‌মুআ ইশতেহারাত; ১ম খন্ড; (লন্ডনে প্রকাশ) পৃঃ ৩০২-৩০৩)

হযরত (আঃ) আরো বলেছেনঃ "মানুষ এখনও আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নয় যে, আমরা কি চাই যেন তারা সেরকম হয়ে যায়। আমরা যা চাই, যে উদ্দেশ্যে

আল্লাহ্ আমাদেরকে আবির্ভূত করেছেন, তা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয় যদি মানুষ বার বার এখানে (ইমাম-আঃ)-এর সান্নিধ্যে না আসে এবং এখানে আসতে যেন বিরক্তিবোধ না করে।"

আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মনে করে যে, এখানে আসতে গেলে তার উপর বোঝা হয়ে যায়; অথবা সে যদি মনে করে যে, এখানে এসে অবস্থান করলে আমাদের উপর বোঝা হবে- তার ভয় পাওয়া উচিত যে, সে শিরক এর মাঝে আছে। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস এই যে, 'পৃথিবীর সকলেই যদি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ্তাআলা আমাদের সমস্ত দায়-দায়িত্বের ভার বহন করবেন। আমাদের উপর সামান্যও বোঝা পড়বে না। বন্ধুদের আগমনে তো আমরা বড় আনন্দ বোধ করি। এটি একটি সন্দেহ যা অন্তর থেকে বের করে ফেলা উচিত। আমি কোন লোককে বলতে শুনেছি, 'আমরা এখানে বসে বসে হুযূর (আঃ)-কে কেন কষ্ট দেব? আমরা তো অপদার্থ! এমনেই বসে বসে রুটি খেয়ে যাব?' তারা যেন স্মরণ রাখে, এটি একটি শয়তানী প্ররোচনা, শয়তান তাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়েছে যেন তাদের পা এখানে থেমে না যায়' [মুলফূযাত; ১ম খন্ড; পৃঃ ৪৫৫]

আল্লাহ্র প্রশংসা করছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত এ জামাত, প্রিয় জামাত সেই ভালবাসার কারণে সেই তা'লীম ও তরবিয়তের কারণে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে দিয়েছেন, জামাতের লোকেরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে এ জলসায় হাজির হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকেন। যেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ অবস্থান করেন সেখানে তো আরো বেশি আগ্রহ নিয়ে অবশ্যই হাজির হতে চান। প্রবল আবেগ নিয়ে বড় বড় আর্থিক ব্যয় বহন করেও আসতে চান। কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে বিরাট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আহমদী আছেন যারা আসতে পারেন না, আকাঙ্ক্ষাকে চেপে রেখে বসে আছেন তারা। আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ যে, এম,টি,এ-র বদৌলতে পৃথিবীর দূর- দূরান্তে নিজ ঘরে বসেই জলসা উপভোগ করছে, জলসায় শামিল হচ্ছেন। 'শুকুর আল্ হামদুলিল্লাহ্'র সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর জন্য দোয়া বেরিয়ে আসে, যিনি এম,টি,এর এ নেয়ামত লাভের জন্য বড়ই চেষ্টা করেছিলেন এবং সাফল্য লাভ করছিলেন। আল্লাহ্ ও রসূলের এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কারণে খিলাফতের জন্য জামাতের এ আবেগ ও ভালবাসাকে আল্লাহ্তাআলা যেন চিরদিন কায়েম রাখেন এবং এতে যেন প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, স্বল্পতা না আসে কখনও। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ জলসার জন্য দোয়া করেছেন এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন যেন এ জলসা আল্লাহ্র স্মরণে হয়। এ জলসায় যেন আধ্যাত্মিক উন্নতি, ধর্মীয় জ্ঞানের উন্নতি হয় এবং তরবিয়তের বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেমন বলেছেন, এ জলসার একটি বড় উদ্দেশ্য হবে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দৃঢ় হওয়া, ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়া; একে অপরের প্রতি দৃষ্টি রাখা; অপর এক ভাইয়ের খাতিরে প্রয়োজনে নিজের অধিকারকে ছেড়ে দেয়ার মত সৎসাহস অর্জন করা, পরস্পরের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসাকে বাড়ানোর এটি একটি ভাল সুযোগ। গত জুমুআর খুতবায় আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, মেহমান ও মেযবান উভয় পক্ষই যেন শুভেচ্ছা ভরা আচরণ করে, সুন্দর আচরণ করে। খুশী ও আনন্দ ভরা পরিবেশ যেন বিরাজ করে এবং পরিবেশকে আরো বেশি সুখকর করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। সর্বক্ষেত্রে যেন এর প্রকাশ ঘটে। একে অপরের সুখ-দুঃখের প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন। বেশি বেশি সহ্য ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। আল্লাহ্ করুন এ লক্ষ্য-মাত্রা যেন অর্জিত হয়। কিন্তু কীভাবে এ লক্ষ্য-মাত্রা অর্জন হবে? কীভাবে একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবেন? এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি পড়ে শোনাচ্ছি। হযরত (আঃ) বলেছেন, "... আমি সত্যিই সত্যিই বলছি, মানুষের ঈমান কখনও সঠিক হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের আরামের উপর নিজ ভাইয়ের আরামকে প্রাধান্য দেয়। যদি আমার এক ভাই আমার সামনে অসুস্থ এবং দুর্বল হয়েও নীচে শয়ন করে আর আমি সুস্থ স্বাস্থ্যবান হয়েও চৌকির উপর স্থান দখল করি যেন সেই দুর্বল ভাই চৌকির উপর বসতে না পারে; যদি ভালবাসা, সমবেদনা সহকারে এ চৌকি সেই ভাইকে না দেই এবং নিজে নীচে মেঝের উপর বিছানা না করি তাহলে আমার এমন মনোভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হয়। একভাই অসুস্থ এবং ব্যথায় জর্জরিত নিরুপায়, এমন অবস্থায় যদি আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা-তদবীর করে সাধ্যমত তার আরামের চেষ্টা না করি এবং আমি আরামে ঘুমিয়ে থাকি তাহলে আমার জন্য দুঃখের বিষয়। আমার এক ধর্মের ভাই (জামাতের ভাই) তার স্বভাবগত কারণে আমার সাথে কিছু কঠিন বাক্য বলে ফেলেছে এবং আমি জেনে-বুঝেও তার সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করি তাহলে আমার এ অবস্থা দুঃখজনক। বরং তার কথা শুনে আমার উচিত, আমি যেন ধৈর্য ধারণ করি এবং নামাযের মাঝে তার জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করি। কারণ সে তো আমার ভাই এবং আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ। আমার যদি কোন ভাই সাদা-সিদা হয়, অল্প জ্ঞান রাখে, অথবা সরলতার কারণে কোন ত্রুটি করে বসে তাহলে আমার তাকে ঠাট্টা করা অথবা ভ্রুকুঞ্চিত করে তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে তার দুর্বলতাকে অন্যদের মাঝে তুলে ধরা উচিত নয়। এ সমস্ত পথ ধ্বংসের। কেউ খাঁটি মু'মিন হয় না যদি তার অন্তর কোমল না হয় নিজেকে সবচে' কম সম্মানের পাত্র মনে না করে এবং সমস্ত অন্তরের কপটতাকে দূর না করে। জনগণের সেবক হওয়া নেতৃত্বের পরিচয় বহন করে। গরীবদের সাথে সম্ভ্রতার সাথে মাথা নীচু করে কথা বলা 'মকবুলে ইলাহী' (আল্লাহ্র প্রিয়) হবার চিহ্ন। মন্দের জবাব পুণ্যের মাধ্যমে দেয়া সৌভাগ্যের চিহ্ন। ক্রোধকে গিলে ফেলা, কটু কথাকে হজম করে নেয়া অত্যন্ত বাহাদুরীর কাজ। কিন্তু আমি দেখেছি আমাদের জামাতের অনেকের মাঝে এটা নেই। ..." [শাহাদাতুল কুরআন; রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩৯৫]

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপরোক্ত নসীহতের উপর আমল করার তৌফীক দান করুন। এবার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ১৯০৩ইং সনের কয়েকটি ইলহামের উল্লেখ করছি যাতে জামাতের

অগ্রগতির শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা নিজ কৃপাবশতঃ আমাদের এসব উন্নতি দেখাচ্ছেন এবং আগামীতেও দেখাবেন। প্রত্যেক ইলহাম, প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। এতে আমরা হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি। আগামীতেও এমনই হবে, ইনশাআল্লাহ্। এটা তো আল্লাহ্‌র তকদীর! এ তকদীর প্রকাশ পাবেই পাবে, ইনশাআল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) -এর খোদ্দামদের (সেবকবৃন্দ) হাতে সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় হবেই হবে। অতএব এ সমস্ত শুভ সংবাদের সাথে সাথে নিজেদের প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় করুন। অনেক বেশি দোয়া করতে থাকুন। আমাদের উপর এটি একটি ভারী দায়িত্ব ও কর্তব্য।

জানুয়ারী ১৯০৩ইং এর একটি ইলহাম। হযরত (আঃ) বলছেন, "একটি হালকা স্বপ্ন; কাশ্‌ফ আকারে আমাকে দেখানো হলো। আমি দেখি, "আমি মহামূল্যবান পোশাক পরিহিত, চেহারা যেন চমকাচ্ছে। এরপর কাশ্‌ফের অবস্থা ওহীর আকারে পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং যে সমস্ত বাক্য ওহী আকারে আমার উপর নাযেল হয়েছে, উক্ত কাশ্‌ফের কিছু পূর্বে এবং কিছু পরেও নাযেল হয়েছে- নীচে লিখছি সেগুলো এই ঃ

"ইউবদি লাকার রাহমানু শায়য়ান ... (অনুবাদঃ) আল্লাহ্ রহমান, যিনি তোমার সত্যতা প্রকাশের জন্য কিছু করে দেখাবেন খোদার আদেশ আসছে। তুমি তাড়াতাড়ি কর না, এটি একটি শুভ সংবাদ যা নবীগণকে দেয়া হয়" তখন সকাল ৫টা বাজে। ১লা জানুয়ারী ১৯০৩ইং; মোতাবেক ১লা শওয়াল; ১৩২০ হিজরী। ঈদের দিন যখন আমার খোদা আমাকে এ শুভ সংবাদ দিয়েছেন" (তাযকিরাহ্ ঃ পৃঃ ৪৪৮)।

তারপর সেই জানুয়ারী মাসেরই আর একটি ইলহাম ঃ (অনুবাদ ঃ) "আমার কাছে এসেছেন, আয়েল। আয়েল অর্থ জীব্রাইল- সুসংবাদ বহনকারী ফিরিশ্‌তা। তিনি নির্বাচন করে নিয়েছেন তোমাকে। তিনি আঙ্গুলে চক্কর দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'খোদা তোমাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন। এবং তার উপর ভেঙ্গে পড়বেন, যে তোমার প্রতি উত্তেজিত হবে" হযরত (আঃ) এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, "আয়েল, মূলতঃ আ ইয়ালাত থেকে উদ্ভূত, অর্থাৎ সংশোধনকারী। যে জালেমের হাত থেকে জুলুম-আক্রান্তকে রক্ষা করে। তাই এখানে জিব্রাইল না বলে আয়েল বলা হয়েছে। এ শব্দের হিকমত এই যে, জালেমের হাত থেকে জুলুম-আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করবে। এজন্য এই ফিরিশ্‌তার নাম 'আয়েল' বলা হয়েছে। তারপর সেই ফিরিশ্‌তার হাতের ইশারা করে দেখিয়েছেন, চারিদিকে শত্রুরা আছে। এবং বলেছে, "ইয়াসিমুকা আল্লাহো মিনাল আদায়ে" আল্লাহ্ তোমাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন।

এটিও পূর্বের ইলহামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (অনুবাদ) ঃ "তিনি করীম (বড় মহান, দয়ালু, দানশীল) তোমার সামনে তোমার আগে আগে চলেছে; যে তোমার শত্রু, তিনি তার শত্রু হবেন।" আয়েল শব্দ সম্ভবতঃ অভিধানে পাওয়া যাবে না, অথবা এর ব্যবহার খুব কম হয়েছে, তাই ইলহামের মাধ্যমে এর অর্থ বলে দেয়া হয়েছে" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ৪৪৯)।

তারপর "১৯০৩ইং এরই আর একটি ইলহাম ঃ (অনুবাদ) তিনি আমাকে শুভ সংবাদ দিয়ে বলেছেন, "আমি তোমার সম্পর্কে (কথিত) এমন সব কথার কোনটাকেই রাখব না যা তোমার জন্য অবমাননাকর।" আরো বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমার হেফাযত করবেন নিজ থেকে এবং তিনি অসীম দয়ালু, বন্ধু।" [তাযকেরাহ্, পৃঃ ৪৫২]

জানুয়ারী মাসেরই আর একটি ইলহাম ঃ (অনুবাদ ঃ) "আমি সেনাবাহিনী নিয়ে তোমার কাছে আসব। আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? পর্বতমালা! তার সাথে খোদার দরবারে ঝুঁকে পড় এবং হে পক্ষীকুল তোমরাও" [তাযকেরাহ্, পৃঃ ৫৪৫]।

জানুয়ারী ১৯০৩ইং এর একটি কাশ্‌ফ আছে। বিবরণ এই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইশার নামাযের পূর্বে রুইয়া শোনালেন, "আমি মিশরে নীল নদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি। আমার সাথে অনেক বনী ইসরাঈলীও আছে। আমি আমাকে মূসা (আঃ) মনে করছি। এমন মনে হচ্ছে যে, আমরা কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি। পেছনে নজর করে দেখি, ফেরাউন এক বড় বাহিনী নিয়ে আমাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছে। তাদের সাথে অনেক জিনিস-পত্র আছে, ঘোড়া, গাড়ী, রথ ইত্যাদি। তারা আমাদের খুব কাছে এসে গেল। আমার সাথের বনী ইসরাঈলী বড় ভয় পেয়ে গেল। অনেকে হতাশ হয়ে পড়ল- উচ্চস্বরে চিৎকার করতে আরম্ভ করে দিল, 'হে মূসা! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!' আমি উচ্চস্বরে বললাম, **কাল্লা ইন্না মায়ীয়া রব্বী সাইয়াহ্‌দিন**, এতক্ষণে আমি জাগ্রত হয়েছি আমার মুখে তখন উপরোক্ত শব্দগুলো ছিল। অনুবাদ ঃ না না, এমন হতে পারে না, আমার প্রভু আমার সাথে আছেন এবং তিনি অবশ্যই আমার জন্য রাস্তা উদ্ভাবন করবেন।

তারপর জানুয়ারী ১৯০৩ইং এরই আর একটি রুইয়া। হযরত (আঃ) লিখেছেন ঃ

"আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি যেমন একটি প্রবন্ধ ছেপে প্রকাশ করতে যাচ্ছি। যেমন করমদীনের মামলার শেষে ফল কী হ'ল [তা প্রকাশ করতে যাচ্ছি]। আমি এ প্রবন্ধের উপর শিরোনাম লিখতে চাচ্ছি, "(অনুবাদ) আল্লাহ্ এ যুদ্ধে কী কী করেছেন-এর বিবরণ।" তারপর আমরা এ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি। সে জীবনের পানি থেকে দূরে সরে গেছে। অতএব তুমি তাকে নিষ্পেষিত করে দাও।

২৮ জানুয়ারী, ১৯০৩ইং তারিখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "আজ সকালে ইলহাম হয়েছে, "সাউকরিমুকা ইকরামান আজীবান", [অনুবাদ ঃ আমি নিশ্চয় তোমাকে আশ্চর্যজনক উপায়ে সম্মানিত করব- অনুবাদক] এর একটু পরেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্নে দেখলাম, 'একটি চোগা [লম্বা জামা -অনুবাদক] খুবই চমৎকার সোনালী রং এর; আমি বললাম, "এ চোগা ঈদের দিন পরব।" এখানে 'আজীবান'-শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, বড় কোন প্রভাব বিস্তারকারী কথা।

জানুয়ারী, ১৯০৩ইং এর ইলহাম ঃ "ইন্নি মায়ার রসূলে ... (অনুবাদ) আমি আমার রসূলের সাথে দন্ডায়মান হব। আমি বিশেষ রহমতসমূহ নাযেল করব এবং আযাবকে প্রতিহত করব। হে পর্বতসমূহ। হে পক্ষীকুল! তোমরাও আমার এ বান্দার সাথে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বিগলিত চিত্তে আমাকে স্মরণ কর। তারা জীবনের পানি হতে দূরে সরে গেছে, সুতরাং তুমি এদেরকে পুরোপুরি নিষ্পেষিত করে দাও।"

তারপর লিখেছেন, ৩০ জানুয়ারী, ১৯০৩ইং তারিখের কথা। "এ রাতে স্বপ্নে দেখলাম, যেমন রাশিয়ার শাসক যারের হাতের ছড়ি আমার হাতে। এর মাঝে লুকানো আছে বন্দুকের নল। উভয় কাজই এর দ্বারা করা যায়। তারপর দেখি যে, সেই বাদশাহ্ যার কাছে বু'আলী সিনা ছিলেন তার ধনুক আমার হাতে। আমি সেই ধনুক দিয়ে একটি বাঘের দিকে তীর চালিয়েছি। বু'আলী সিনাও সম্ভবতঃ আমার সাথেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সেই বাদশাহ্ও।"

ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ইং এ ভ্রমণের সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কতিপয় ইলহাম শোনালেন যা গত রাতে তাঁর উপর নাযেল হয়েছে। (অনুবাদ) "আমরা তোমাকে মুক্তি দান করব। এবং তোমাকে বিজয় দান করব। আমি তোমার সঙ্গে এবং তোমার অনুসারীদের সাথে আছি। আমি তোমাকে এতটা সম্মানিত করব যে, মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। আমি হঠাৎ করে সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হব। আমি আমার রসূলের সাথে দাঁড়াব এবং এমন জিনিস দেব যা চিরকাল তোমার সাথে থাকবে" (তাযকেরাহ্, পৃঃ ৪৫৯]।

ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ইং (অনুবাদ) "আমি রসূলের সঙ্গে থেকে জবাব দিব। আমি আমার ইচ্ছা কখনও ছেড়ে দিব, কখনও পুরা করব। আর কিছু অংশের অনুবাদ হযরত (আঃ) স্বয়ং করেছেন, "আমি বিশেষ আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ করে উপস্থিত হব। আমি আমার রসূলের সমর্থনে [তাদেরকে] ঘিরে ফেলব" [তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৬২]।

১৯০৩ইং এর ইলহাম "(অনুবাদ ঃ) "তারা আগ্রহ করবে যেন তোমার কাজ অসম্পন্ন থাকে। আল্লাহ্ তোমাকে ছেড়ে দিতে চান না যতক্ষণ তোমার কাজ সম্পূর্ণ করে না দেন" [তাযকেরাহ্; ৪৬৬ পৃঃ]।

১৯০৩ইং-এর ইলহাম ঃ "ইন্না নারেসার আবয়া না'কুলুহা মিন আতরাফিহা (অর্থাৎ) আমরা পৃথিবীর ওয়ারিস হব এবং আমরা এর প্রান্ত থেকে গ্রাস করে আসব" (তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৬৬)।

এপ্রিল, ১৯০৩ইং এর ইলহাম ঃ "রব্বি ইন্নী মাযলুমুন ফানতাসির ফাসাহ্হিকহুম তাসহিকা" (অর্থাৎ) হে আল্লাহ্! আমি অত্যাচারিত হয়েছি, তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং তাদেরকে ভালভাবে নিষ্পেষিত কর।" বর্তমানে সকল আহমদীর এ দোয়া করা উচিত। এদিকে মনোযোগ দিবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "আমি একবার কাশ্ফে রূপকভাবে আল্লাহ্তাআলাকে দেখেছি। আমার গলায় হাত দিয়ে ঘিরে বললেন, (অর্থ ঃ)" যদি তুমি আমার হয়ে থাক, সমস্ত বিশ্ব তোমার হোক" [তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৭১]।

আগষ্ট, ১৯০৩ইং এর একটি ইলহাম ঃ "(অনুবাদ ঃ) হযরত তোমরা মর্যাদা সম্পর্কে তারা জিজ্ঞেস করবে, তুমি বলে দাও, 'তিনি খোদাতাআলা যিনি আমাকে মর্যাদা দিয়েছেন। আকাশ ও পৃথিবী পুটলীর মত বাঁধা ছিল। তারপর আমরা একে খুলে দিয়েছি। তুমি কি দেখবে না যে, তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কী করেছেন? তিনি কি তাদের পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করে দেন নি? আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন, "আমি ও আমার রসূলে বিজয়ী হব। তুমি বিজয়ের সময় এসেছ" (তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৮০)।

অক্টোবর, ১৯০৩ইং এর ইলহাম (অনুবাদ) প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে এ গৃহে আছে, আমি আলোকিত করব। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাফল্য এবং খুলাখুলি বিজয়। খোদার পক্ষ থেকে সাফল্য এবং বিজয়। আহমদের গৌরব। আমি রহমান খোদার উদ্দেশ্যে রোযা রাখার মান্নত করেছি" (তাযকিরাহ্, পৃঃ ৪৯৫)।

নভেম্বর, ১৯০৩ইং এর ইলহাম "মেরি ফাতাহ্ হুয়ি মেরা গালাবা হুয়া" অনুবাদ ঃ আমার বিজয় আমার প্রাধান্য লাভ হয়েছে' [তাযকেরাহ্ঃ পৃঃ ৪৯৮ইং]।

২৬ নভেম্বর, ১৯০৩ইং এর একটি ইলহাম ঃ "লাকাল ফাত্হো ওয়ালাকাল গালাবাতো" তোমার জন্য বিজয় এবং তোমার জন্য প্রাধান্য (তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৯৮)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ঃ

"হে লোক সকল! এ ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যিনি ভূ-মন্ডল ও আকাশমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর এ জামাতকে পৃথিবীর সকল দেশে ছড়িয়ে দিবেন। দলিল প্রমাণ দিয়ে, নিদর্শন দিয়ে সকলের উপর একে বিজয় দান করবেন। সে দিন আসছে। বরং খুব নিকটে যখন সমগ্র পৃথিবীতে এই একটি ধর্ম হবে, সম্মানের সাথে একে স্মরণ করা হবে। খোদাতাআলা এ ধর্মকে এ সিলসিলাহ্কে (নেযামে জামাতকে) অত্যন্ত উন্নতমানের এবং অসাধারণভাবে বরকতমন্ডিত করবেন। প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে এর ধ্বংসের চিন্তা করে তাকে ব্যর্থ করে দিবেন। এ বিজয় চিরস্থায়ী বিজয়, কিয়ামত আসার পূর্ব পর্যন্ত অটুট থাকবে এ বিজয়। ... স্মরণ রাখ, আকাশ থেকে কেউ নেমে আসবে না। আজ আমাদের বিরোধীরা যারা জীবিত আছে এরা সবাই মারা যাবে ...। তারপর এদের বংশধর যারা অবশিষ্ট থাকবে তারাও মারা যাবে ...। তারপর তাদের সন্তানদের সন্তানেরা মরে যাবে তারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখবে না। তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে ব্যাকুল করে দিবেন যে, ক্রুশ ধর্মের বিজয়ের যুগ পার হয়ে গেল, পৃথিবীর অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। কিন্তু মরিয়ম পুত্র ঈসা এখনও আকাশ থেকে নেমে আসলেন না। তখন বুদ্ধিমানরা এ আকীদার (ধর্ম-বিশ্বাস) প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে এবং তখনও তৃতীয় শতাব্দীর দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে না- যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনে অপেক্ষায় যারা ছিল, মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান সকলেই অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়বে এবং বিশ্বাস হারিয়ে এ আকীদাকে পরিত্যাগ করবে। পৃথিবীতে তখন মাত্র একটিই ধর্ম থাকবে এবং একজনই ইমাম থাকবেন। আমি তো বীজ বপন এসেছি। সুতরাং আমার হাত দিয়ে সে বীজ বপন হয়ে গেছে এবং এখন এ বীজ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এর প্রতিফলন বাড়তেই থাকবে এবং এমন কেউ নেই যে, এর গতি রোধ করতে পারে" [তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৯৩]।

ডিসেম্বর, ১৯০৩ইং এর ইলহামের উল্লেখ করা হয়েছে। "হযরত হুজ্জাতুল্লাহ্ (আঃ) গুরুদাসপুর অবস্থানকালে সেখানে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সকল খোদ্দামের জন্য (জামাতের সকলের জন্য) সাধারণভাবে দোয়া করেছেন (ঢালাও ভাবে) যারা উপস্থিত ছিলেন, যাদের নাম স্মরণ এসেছে তাদের নাম ধরে, এবং সকলের জন্য সাধারণভাবে দোয়া করেছেন যার ফলে ইলহাম হয়েছে

"ফাবুশরা লিল মু'মিনীন', সুতরাং মু'মিনদের জন্য শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে" [তাযকেরাহ্; পৃঃ ৪৯৯]।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অগণিত রূইয়া এবং ইলহাম রয়েছে, ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা আমরা পূর্ণতা লাভ করতে দেখেছি, একবার নয় বার বার। যেমন ধরুন, সাহ্হিকহুম তাসহিকা (তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও) এর ফলে আমরা কতবার শত্রুদেরকে নিষ্পেষিত হতে দেখেছি এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ মাটি হয়ে উড়তে দেখেছি, তাদের সন্তানদের উপরও বিপর্যয় নেমে আসতে দেখেছি। কত নিদর্শন আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করেছে এবং হযরত (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের উপর ঈমানও ইয়াকীন (বিশ্বাস) বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতেও ইন্শাআল্লাহ্ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করবে এবং পূর্ণতা লাভ করতেই থাকবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা 'আমি আসব, এবং অবশ্যই আসব।' তিনি সত্যই প্রতিজ্ঞা-রক্ষাকারী খোদা। তিনি যখন বলেছেন, 'আমি শত্রুদের ঘেরাও করব,' তখন অবশ্যই তিনি তা করবেন। তিনি অবশ্যই তাদেরকে ঘেরাও করবেন। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা এ সমস্ত অঙ্গীকারকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে। তবে হ্যাঁ একটি শর্ত আছে আর তা এই যে, **আমরা যেন আন্তরিকতার সাথে এ সবের প্রতি ঈমান রাখি এবং আল্লাহ্‌র হয়ে যাই। তাঁর ভয়, তাঁর ভীতি আমাদের উপর বিস্তৃতি লাভ করে। প্রত্যেক কাজ-কর্মে তাকওয়া যেন আমাদের আবরণ ও আচ্ছাদন হয়ে, যেন আমাদের দুর্বলতার কারণে আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণে দেরী হয়ে না যায়।**

জলসায় শামিল যারা হয়েছেন তাদের পক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়াসমূহের কোন কোন অংশ এখন পড়ে শোনাচ্ছি। হযরত (আঃ) দোয়া করেছেন ঃ

"প্রত্যেক ব্যক্তি যে এ জলসায় শামিল হবার জন্য সফরে বেরিয়েছেন, খোদাতাআলা তাদের সাথী হোন। তাদেরকে অনেক পুরস্কার দান করুন। তাদের প্রতি দয়া করুন। তাদের কষ্ট, তাদের উদ্বেগকে দূর করে, অবস্থাকে তাদের জন্য সহজ করুন। তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করুন। তাদের সকল কষ্ট দূর করে দিন। তাদের উদ্দেশ্য সফলের জন্য পথ তাদের জন্য খুলে দিন। পরকালে তাদেরকে আল্লাহ্ নিজ প্রিয় বান্দাদের সঙ্গী করে দিন যাদের প্রতি তাঁর ফযল ও রহম রয়েছে। তাদের যাত্রা শেষে তাদের পরে তাদের খলীফা হোন। হে আল্লাহ্! হে বুযূর্গী ওয়ালা, দানশীল এবং রহীম ও কষ্ট দূর করেন যিনি! এ সমস্ত দোয়া কবুল কর। আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর সাহায্যে আমাদেরকে বিজয় দান কর। প্রত্যেক প্রকার ক্ষমতা তোমার আছে। সকল শক্তিই তোমার আছে, আমীন, সুম্মা আমীন।'

(ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর, ১৮৯২ইং, মজমুআ ইশ্‌তেহারত, ১ম খন্ড. পৃঃ ৩৪২)

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ সমস্ত দোয়ার ওয়ারীস করেন। আমাদের দ্বারা এমন কোন কাজ যেন না হয়ে যায় ফলে এ সমস্ত দোয়া থেকে আমরা দূরে ছিট্‌কে পড়ি। দোয়া করতে বহু শক্তি ব্যয় করুন। জলসায় যারা এসেছেন সবার জন্য দোয়া করুন। অনেকে এখনও আসার পথে আছেন, তাদের জন্য দোয়া করবেন। এ জলসার কল্যাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা ঘরে বসে আছেন, শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যারা জলসায় আসতে পারেন নি- তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন।

আমি আগেও বলেছি, বড় বিশাল ব্যাপক ব্যবস্থা, সাময়িক ব্যবস্থা, তাই কিছু ব্যবস্থাপনার ত্রুটি থেকেই যাবে। এ অবস্থায় আপনারা আপনাদের এসব কর্মরত ভাইদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিবেন। ক্ষমাশীল আচরণ করুন। কোন কর্মরত খাদেম ইচ্ছাকৃত অবহেলা করবে না। সবাই বড় আন্তরিকতার সাথে মহব্বতের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমানদের খেদমত নিয়োজিত। আপনারা এদের সাথে আল্লাহ্‌র খাতিরে যে পুণ্যভরা আচরণ করবেন সেটাও আপনাদের নেকী বলে গণ্য হবে। জলসার যে সমস্ত বরকত লাভ হয় এর মাঝে এটিও একটি বরকত লাভের উপায় হবে। যারা আল্লাহ্‌র জন্য কোন কাজ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দেন না-এটা আল্লাহ্‌র পদ্ধতি নয়। আল্লাহ্ করুন এ জলসায় আমরা যেন পূর্বের চেয়েও বেশি আল্লাহ্‌র ফযল দেখি। সব সময় আপনারা আল্লাহ্‌র ফযলের বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন। আল্লাহ্‌র শোকরগুযার বান্দা হয়ে যান। বান্দা যখন তার দয়ালু খোদার শোকরগুযারী করে, খোদা দয়াময়, খুবই দয়ালু খোদা, অনেক দান করেন; তিনি পূর্বের চেয়েও বেশি করে দেন। রাজা-বাদশাহ্‌দের ধন-ভান্ডার শেষ হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্‌র ধন-ভান্ডার কখনই শূন্য হতে পারে না। প্রত্যেক শোকরগুযারীর পরে তিনি তাঁর ওয়াদা অনুসারে অনেক বেশি ফযল ও রহমত দান করেন বা দান করতে থাকেন।

আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এটিও একটি পদ্ধতি যে, আপনারা যে উদ্দেশ্যে এসেছেন অর্থাৎ জলসা শুনবেন, সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন; পুরোপুরি অংশগ্রহণ করবেন, বেশি বেশি সুফল লাভের চেষ্টা করবেন। এ তিন দিন পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্‌র মর্জিমত জীবন যাপন করুন, সময় অতিবাহিত করুন। আল্লাহ্ সকলকে এ সমস্ত করার তৌফীক দান করুন।

অবশেষে আমি পুনরায় দোয়ার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ **একমাত্র দোয়ার মাধ্যমেই আমাদের সকল কাজ সুসম্পন্ন হয়; দোয়ার মাধ্যমেই আমরা সকল প্রকার মঙ্গল, রহমত, বরকত লাভ করি।** জলসার এ দিনগুলোতে অনেক বেশি দোয়া করুন। কালকেও বলেছিলাম, চলতে ফিরতে, উঠতে-বসতে যিক্‌রে ইলাহী করতে থাকুন। দুরূদ শরীফ পাঠের উদ্যোগ নিবেন। অনেক অনেক ইস্তিগফার করুন। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হউন। আল্লাহ্ আপনাদেরকে জলসার সকল ইলমী (জ্ঞানমূলক) ও রূহানী বরকত দান করুন। এখানে একথাও উল্লেখ করছি যে, ইংল্যান্ডের দূতাবাসগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে এ জলসায় আসার জন্য খুব সহজ উপায়ে ভিসা প্রদান করেছে, যারা জলসা শুনতে এসেছেন- জলসার নিয়্যতে ভিসা নিয়েছেন- তারা জলসা শুনবো বলেই ভিসা নিয়েছেন- সুতরাং আপনারা জলসার পরে নিজ নিজ দেশে ফেরত যাবেন। কেউ যেন ইউরোপের কোন দেশে না যান। জলসার পরে প্রোগ্রাম যা-ই হোক, শেষে নিজ নিজ দেশে ফেরত যাবেন, জাযাকুমুল্লাহ্।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইং)।

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

তোমরা যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভ্রাইদেরকে ক্ষমা কর।

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ইং তারিখে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহার পর সূরাতুল হুযুরাত আয়াত ১০-১১ তেলাওয়াত করে হুযূর (আইঃ) খুতবা এরশাদ করেন।

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

অনুবাদ ঃ এবং যদি তোমাদের দু'দল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করিয়ে দাও; যদি (মীমাংসার পরে) তাদের উভয়ের মধ্যে একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আক্রমণ করে তাহলে তোমরা সকলে মিলে বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে দল আল্লাহ্‌র আদেশের দিকে ফিরে না আসে। যদি ফিরে আসে, তাহলে তোমরা তাদের উভয় দলের মধ্যে ন্যায় পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

আজকাল পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিন এমন খবরে ভরা থাকে যে, অমুক দেশে এই ফাসাদ শুরু হয়েছে। অমুক দেশে ঐ ফাসাদ হয়েছে। মানুষ পরস্পর লড়াই করছে। আদালতে গেলে মনে হয় যেন লড়াই ঝগড়া-ফাসাদ মামলা মুকদ্দমা ছাড়া মানুষের অন্য কোন কাজ নেই। আমাদের দেশ পাকিস্তান এবং সমগ্র ভারত উপমহাদেশের সর্বত্রই সাধারণত একথা প্রচলিত আছে যে, যখনই জমিদারদের হাতে টাকা পয়সা হয় তখনই তারা লড়াই ঝগড়া করে মামলাবাজি শুরু করে দেয় এবং সমস্ত টাকা শেষ করে দেয়। এমন জমিদার বা গ্রামের কৃষকরা সব সময় ঋণের নীচে চাপা পড়ে থাকে। অধিকাংশ গরীব দেশের কৃষক বা জমিদারদের সম্পর্কে প্রচলিত আছে যে, তারা জন্মগ্রহণ করে ঋণের বোঝা কাঁধে করে; ঋণের বোঝা নিয়েই

জীবন যাপন করে এবং ঋণের বোঝা ওয়ারিশদের উপর রেখেই মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু যখনই ফসল ভাল হয় বা ভাল আয় হয়, টাকা হয়, মামলা মুকদ্দমা শুরু করে দেয়। এক এক ফুট জমি নিয়ে ফেৎনা-ফাসাদ হতে থাকে। অনেক সময় লড়াই-ঝগড়া হয়ে খুনাখুনি হয়ে যায়। তারপর মামলা চলতে থাকে। তাদের যা উপার্জন হতে থাকে মামলা চালাতে– উকিলকে দিতে এবং সমর্থক গোষ্ঠীর খাতিরে ব্যয় হতে থাকে। তারপর ঋণ করে করে মামলা চালাতে থাকে। আমাদের অনেক মানুষ গ্রামের জমিদার শ্রেণী থেকে এসেছেন তারা জানেন যে, কি হয় সেখানে। আপোষ বা মীমাংসার কোন কথা হয় না। শহরেও ঐ একই অবস্থা। সামান্য সামান্য বিষয়ে লড়াই ঝগড়া হয়ে যায়। সমস্ত শক্তি নিজেদের মিথ্যা অহংকারকে কেন্দ্র করে ধ্বংস হতে থাকে। তাদের মনে আল্লাহ্‌র জন্য কোন স্থান থাকে না। মুসলমানদের মধ্যে এটা বেশি। পাকিস্তানেও দেখবেন। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি কি মুসলমান? উত্তর হবে হ্যাঁ, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। মাশাল্লাহ্ আমরা তো মুসলমান। কিন্তু তারা এমন মুসলমান যে, ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করে না। সুতরাং তাদের অবস্থা তো ওরকমই হবার ছিল। তাইতো সংশোধনের জন্য হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) -এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। অন্যান্য দেশগুলোর অবস্থা এই যে, অন্যায়ভাবে অন্যদের দেশকে শান্তির নামে নিজেদের অধীনে করে রাখে, ক্ষমতার বলে অধীনে করে রাখে। নিজেদের সুবিধামত শর্তে তাদেরকে বেঁচে থাকার সুযোগ দেয় মাত্র। শুধু এজন্য যে, ঐসব ছোট দেশগুলোর রিসোর্সেস থেকে নিজেরা উপকৃত হতে পারে, তাদের সম্পদ নিজেরা গ্রাস করতে পারে। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে যে ফেৎনা ফাসাদ দেখা যাচ্ছে তার কারণ এটাই। পৃথিবীর বেশি বেশি সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে, অন্যান্য সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে, ধন-দৌলত অর্জনের উদ্দেশ্যে। অথবা এভাবে বলতে পারেন যে, অন্যদের সম্পদের উপর নজর রাখার কারণে অন্যের সম্পদকে নিজেদের দখল করার লোভের কারণে সমস্ত ফাসাদ। আজকের যুগে এসব কিছু এজন্য এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আল্লাহ্‌তাআলা যেভাবে অন্যায় ভাবে সম্পদ অর্জন করতে নিষেধ করেছিলেন-আজ সবাই তা লঙ্ঘন করেছে। যেমন সুদ- এখনও সুদ অনেক প্রকারের, অনেক রকমের সুদ বেরিয়েছে-; যদি কেউ সুদ থেকে বাঁচতেও চায় তবু সে পথ খুঁজে পায় না যে কিভাবে বাঁচবে। কেউ বিনা সুদে ধন নিয়েছে, কিন্তু তাদেরও সুদ আছে। শয়তানী চক্র এভাবে সবকিছুতে জড়িয়ে আছে যে, কেবলমাত্র মুমেন যদি তাকওয়া অবলম্বন করতে চায়- সে ছাড়া অন্যদের বাঁচা কঠিন। যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে সুদ না-ও নেয় তবুও তো দেশ বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুদের উপর যে ঋণ নেয়া হয়েছে সবাই তার মধ্যে জড়িয়ে আছে। দেশ বা রাষ্ট্রকে তো ঐ সুদের পাই-পাই পরিশোধ করতে হবে। এ কারণে আল্লাহ্ বলেছেন, "যাহারাল ফাসাদো ফীল বার্‌রে ওয়াল বাহ্‌র" [সূরা রুম ঃ ৪২]

"স্থলে ও জলে ফাসাদ ছেয়ে গেছে," এর দৃশ্য সবাই দেখবে। অর্থাৎ এসব অযোগ্য লোভ-লালসা, এসব চালাকী, সুদের ব্যবসা, অন্য মানুষের সম্পদ দখলের এসব পদ্ধতি এবং আল্লাহ্‌র সাথে শিরকের কারণে পৃথিবীতে সর্বত্র ফাসাদ দেখা দিবে। আজ দেখুন এই সব কিছুই হচ্ছে। সাধারণভাবে কারণ এগুলোই। কিন্তু বর্তমান যুগে মোমেনদের জন্য, যারা যুগ ইমামকে মান্য করেছেন তাদের জন্য নসিহত (হিতোপদেশ) এই যে, এমন অবস্থায় তোমরা নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করবে। উভয় পক্ষের মাঝে আপোষ করতে চেষ্টা করতে হবে। পারিবারিক পর্যায়ে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হোক, ব্যসায়ীদের মাঝে ঝগড়া হোক, তা সে মিথ্যা আমিত্বকে প্রতিষ্ঠার ঝগড়া হোক, জাতীয় পর্যায়ে ঝগড়া হোক- জাতীয় পর্যায়ের অর্থ জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নয় বরং আজকের খুতবায় আমি ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর কথা বলছি, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের কথা বলছি। তবে জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের ঝগড়া সম্পর্কেও যে শিক্ষা আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে শিখিয়েছেন- জাতিগুলো যদি সে শিক্ষাকে মেনে নেয় তবে তাদের অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত ফাসাদ মিটানো সম্ভব হতে পারে। সমস্ত ঝগড়া ফাসাদ মিটানো যেতে পারে। শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যেসব সংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সফলতা দিতে পারে। ইউ.এন.ও.-ও তখনই সাফল্য লাভ করতে পারবে। যাক, সেটি একটি পৃথক বিষয়। আজ এ সময় আমি সামাজিক পর্যায়ে, সমাজ সম্পর্কে কথা বলছি।

মোমেনদের জন্য নির্দেশ এই যে, প্রথমত তোমরা ঝগড়া-বিবাদ হতে নিজকে দূরে রাখ। তারপর যদি নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে মোমেন ভাইয়েরা সবাই মিলে বিবাদ মীমাংসা করে ফেলবেন এবং বিবাদমান দু'জন বা দু'পক্ষের মধ্যে আপোষ করিয়ে দিবেন। উভয়পক্ষকে বুঝতে হবে যে, ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করা ভাল না। কেন তোমরা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হতে যাচ্ছ? পরস্পর নিজেরা আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নিতে পার না। একে অপরের প্রতিশোধ নিতে পার না। বুঝানোর ফলে যদি তারা বুঝে যায় তাহলে ভাল। যদি তোমরা মীমাংসা করে ফেলে তাহলে ভাল। আর যদি কোন এক পক্ষ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। সমাজে তাকে কোন সম্মানজনক স্থান দেয়া হবে না। তার সাথে কোন রকম সহযেগিতাও করা হবে না। অনেক সময় অনেকে আমাদের জামাতের কাযা বোর্ডে মামলা নিয়ে আসে। সালিশ করাতে আসে। তারপর যখন সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তখন কেউ কেউ সে সিদ্ধান্ত মানতে চায় না বা মানে না। ফলত তার বিরুদ্ধে জামাতের পক্ষ থেকে সংশোধনমূলক কোন ব্যবস্থা নিতে হয়। তাকে কোন প্রকার শাস্তি দেয়া হয়। কারণ জামাতের মধ্যে থেকে জামাতের একজন সদস্য হয়ে যখন কেউ সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করে তখন তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত। কোন পুলিশ বাহিনী তো আমাদের নেই। সুতরাং যখন কাউকে শাস্তি দেয়া হয় তখন তার বন্ধু বান্ধবেরা, আত্মীয়-স্বজনরা তাকে বুঝাতে হবে যে, সে যেন জামাতের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। এমন না করে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত অমান্যকারীর সমর্থন করতে শুরু করে দেয়। অথচ এভাবে অন্যায় সমর্থনের ফলে ঐ শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির সংশোধন হয় না। সে বুঝতে পারে যে, আমারও এক গ্রুপ আছে যারা আমার কাছের লোক তারা তো আমাকে খারাপ বলছে না! যে সমাজে সে উঠাবসা করে সে সমাজের চোখে তার কোন আচরণ মন্দ মনে হচ্ছে না। ফলে তার সংশোধন হয় না। অতএব, সংশোধনের জন্য নির্দেশ, পুরো সমাজের জন্য নির্দেশ এই যে, যখন কারো বিরুদ্ধে কোন শাস্তি দেয়া হয় তখন পুরো সমাজ তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকবে যেন তার সংশোধন হয়- অন্যায়ভাবে তাকে যেন সমর্থন দেয়া না হয়।

কিন্তু বর্তমান যুগে মোমেনদের জন্য, যারা যুগ ইমামকে মান্য করেছেন তাদের জন্য নসিহত (হিতোপদেশ) এই যে, এমন অবস্থায় তোমরা নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করবে। উভয় পক্ষের মাঝে আপোষ করতে চেষ্টা করতে হবে।

সুতরাং এমন লোকদের বুঝাবার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকা উচিত। সিদ্ধান্ত ঠিক হোক বা ভুল হোক (আপিলের পরও যদি শাস্তি বহাল থাকে) তার সকল অধিকার স্থগিত হয়ে যায়। এখন সমাজের উচিত তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকা। সিদ্ধান্তকে যেন সে মেনে নেয় এবং সে যেন যা আদেশ হয়েছে তা মেনে চলে। যদি সঠিক অর্থে চাপ সৃষ্টি করা হয় তাহলে কাজ হয়। কারণ সমাজের চাপ কেউ সহ্য করতে পারে না। অতএব, সমাজের ভেতরের বা জামাতের অভ্যন্তরের ছোট ছোট অনেক বিষয় এমন আছে যেখানে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ এভাবে পালন করতে হবে যে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর অর্থাৎ তাদের উপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি কর। সামাজিক চাপ থাকবে, আত্মীয়-স্বজন চাপ সৃষ্টি করবে; বন্ধু-বান্ধব চাপ সৃষ্টি করবে। এভাবে চারিপাশ থেকে যখন কেউ চাপের মুখে পড়বে তখন সে জামাতী সিদ্ধান্তকে অমান্য করতে পারবে না। এভাবে পুরো সমাজ জামাতী নেযামকে সাহায্য করবে। বরং আমি বলব; যখন দু'চারটি ঘটনা এমন ঘটবে তখন আলোচ্য আয়াতের নির্দেশে এমন একটি সমাজ গঠিত হবে যেখানে কেউ কারো উপর কোন প্রকার অন্যায় হস্তক্ষেপ করার সাহসই করবে না। জামাতের মধ্যে এসব লড়াই-ঝগড়া হবে না, ফেৎনা-ফাসাদ হবে না।

তারপর বলেছেন যে, এভাবে চাপ সৃষ্টির ফলে যখন অপর পক্ষ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হবে, আপোষ করতে রাজি হবে, তারপর সমাজের সকল মানুষ, তার বন্ধু-বান্ধব, জামাতী নেযামের কর্মকর্তারা তার সাথে যেন সহযোগিতা করে এবং নিজেদের আমিত্ব প্রদর্শন না করে। যে সকল শর্তের ভিত্তিতে আপোষ হয়েছে সে সকল শর্ত যেন পুরণ করা হয়, বাস্তবায়ন করা হয়। তারপর প্রত্যেক পক্ষকে ভুলে যেতে হবে যে কিছু হয়েছিল। বিশেষ করে যে পক্ষ অধিকার

অতএব, সংশোধনের জন্য নির্দেশ, পুরো সমাজের জন্য নির্দেশ এই যে, যখন কারো বিরুদ্ধে কোন শাস্তি দেয়া হয় তখন পুরো সমাজ তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকবে যেন তার সংশোধন হয়- অন্যায়ভাবে তাকে যেন সমর্থন দেয়া না হয়।

পেয়েছে বা যারা শর্ত পূরণ করবে। এমন যেন না হয় যে, কিছুদিন পর স্মরণ করানো হচ্ছে যে, তোমাদের সাথে এমন হয়েছিল। তোমরা শাস্তি পেয়েছ। তোমাদের সাথে এমন হয়েছিল। অতীতকে ভুলে যাওয়া উচিত। শর্তগুলো পূরণ হয়ে যাওয়ার পরে তাদেরকে সমাজে অন্য সকলের সমান মর্যাদা যেন দেয়া হয়। সকলে যে সম্মান পায় তারাও তা পাবে। অপর পক্ষ যাদের পাওনা অধিকার পাচ্ছিল না তারা তো এখন পেয়ে গেছে, সুতরাং তাদেরকে বলতে হবে যে, এরপর ওদের সাথে আর দূরত্ব রাখবে না, এখন মায়া মমতার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। অন্তরে ওদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রাখবে না। এভাবে যদি সমাজে ন্যায় বিচার এবং বিচারের আনুসাঙ্গিক দিকগুলোর প্রতি নজর রাখা হয় তাহলে আল্লাহ্‌তাআলাও তাদেরকে ভাল বাসবেন। আর আল্লাহ্‌র ভালবাসা যদি লাভ হয় তাহলে এটা বিরাট বড় সাফল্য যা একজন মোমেন পেতে পারে।

তারপর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'সকল মোমেন ভাই ভাই।' অতএব, সমাজে তারা সবাই ভাই ভাই হয়ে থাকবে। [অর্থাৎ মিল মহব্বতের সাথে] যদি কোন কারণে বিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে তা মীমাংসার পথ অবলম্বন করতে হবে। সমাজের সবাই জামাতের প্রত্যেকে একে অপরের অধিকার সংরক্ষণ করবে, একে অপরের অধিকার তাকে দিবে। এটা তাকওয়া বা খোদাভীতি। এভাবেই তোমরা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে হুকুকুল ইবাদ আদায়কারী বলে বিবেচিত হবে। যখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে; তখন আল্লাহ্‌তাআলা এই অপেক্ষায় থাকেন যে কিভাবে নিজ বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন, তিনি তখন তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

এবার কতিপয় হাদিস পড়ে শোনাচ্ছি যেখানে আঁ-হযরত (সঃ) সমাজের সংস্কারের কথা বলেছেন। হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবি মুইত রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আমি আঁ-হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, "এমন ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলা যায় না যে, মানুষের মধ্যে সংশোধন আনয়নের উদ্দেশ্যে ভাল কথা তাদেরকে শোনায় বা মঙ্গলের কথা বলে।" [বোখারী, কিতাবুস সুলহ] অর্থাৎ এমন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হয় না যে মানুষের সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভাল কথা বলে। কোন সময় দু'জন ব্যক্তির মাঝে সম্পর্ক ভাল থাকে না। কিন্তু যখন তাদের মাঝে সুসম্পর্ক থাকে তখন তাদের মধ্যেকার ভাল কথা বা মন্দ কথা, পুণ্যের কথা বা ত্রুটির কথা জানা যায়। তৃতীয়

শর্তগুলো পূরণ হয়ে যাওয়ার পরে তাদেরকে সমাজে অন্য সকলের সমান মর্যাদা যেন দেয়া হয়। সকলে যে সম্মান পায় তারাও তা পাবে। অপরপক্ষ যাদের পাওনা অধিকার পাচ্ছিল না তারা তো এখন পেয়ে গেছে, সুতরাং তাদেরকে বলতে হবে যে, এরপর ওদের সাথে আর দূরত্ব রাখবে না, এখন মায়া মমতার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে।

ব্যক্তি যার সম্পর্ক উভয়ের সাথেই ভাল আছে, সে ঐ দুইয়ের কোন একজনের ভাল কথা কারো থেকে শুনে তাদের মীমাংসার জন্য অপরজনকে গিয়ে বলে এবং তাকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, দেখ! অমুক ব্যক্তি তোমাদের সম্পর্কে এক সময় বলেছিল যে, তোমাদের মধ্যে এই এই নেকী আছে। তার অন্তরে তোমার যথেষ্ট সম্মান আছে। যেসব কথার কারণে তোমার মনে তার সম্পর্কে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো ভুলে যাও। আপোষ কর, এসব ছোট ছোট কথাকে এত গুরুত্ব দিতে হয় না ইত্যাদি। বলা হয়েছে এমন ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলা যেতে পারে না। তারা (বিবাদকারীরা) কেউ কারো সম্পর্কে মন্দ কথা বলেছিল কি বলেছিল না, সেটা সে জানত বা জানত না এটা বড় কথা নয়। কারণ সে আপোষ বা মীমাংসার চেষ্টা করেছে, অতএব সেখানে কেবল তার ভাল কথাগুলো বল। তার মন্দ কথাগুলো বলার প্রয়োজন নাই। ঝগড়া-ফাসাদকে উস্কে দেয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কেউ কেউ এমন ফেৎনাবাজ থাকে যে দেখা গেছে, তারা কেবল মজা করার, উপভোগ করার জন্য দু'জনের মধ্যে লড়াই ঝগড়া বাধিয়ে দেয় এবং মজা দেখে যে, দু'জন কিভাবে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ছে। যদি তারা তাদের সম্পর্কে কোন মন্দ কথা পেয়ে যায়, তাহলে তার সাথে মশলা লাগিয়ে তাদেরকে বলে দেয়। এমন লোকেরা ফেৎনাবাজ হয় তো বটেই, তার সাথে মিথ্যাবাদীও হয়। সুতরাং সমাজের সংস্কারের জন্য একজনের ভাল কথা অন্যজনকে বলা প্রয়োজন। বলা হয়েছে, "সবসময় ভাল এবং সৎ পরামর্শ দিবে, আপোষ মীমাংসার পরামর্শ দিবে।" পুণ্য ও মঙ্গলজনক পরামর্শ দিবে। মিথ্যাবাদীর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মিথ্যাবাদীর সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। তারপর আরো শাস্তি আছে।

একটি হাদিসে আছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক দিন যার উপর সূর্যোদয় হয় মানুষের প্রত্যেক অঙ্গের জন্য সাদকা আছে। তুমি যদি দু'ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় বিচার করে দাও, তো এটি সাদকা। যদি কোন ব্যক্তিকে যান বাহনের উপর উঠে বসাতে সাহায্য কর অথবা যানবাহনের উপর তার জিনিসপত্র বোঝাই করতে সাহায্য কর, তাহলে এটি সাদকা। ভাল কথা বল, এটিও সাদকা। নামাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা পথের তোমার প্রত্যেক পদক্ষেপ সাদকা। তুমি যদি রাস্তার উপর থেকে কোন কিছু সরিয়ে ফেল যা কারো জন্য কষ্টের কারণ হতে পারত তো এটিও সাদকা।" (বোখারী; কিতাবুল জিহাদ)।

এখানে দেখুন, ভাল কথা বলা কল্যাণকর কথা বলা, পুণ্যের কাজ; আপোষ বা সন্ধির কথা বলাও ঐ রকম পুণ্যের কাজ যেমন আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নেয়া পুণ্যের কাজ। এখান থেকে একথা জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের খেদমত (সেবা) যারা করে; মানুষের ন্যায্য পাওনা আদায় করে দেয় যারা তারাও অনুরূপ সওয়াব পায় যেমন ইবাদতগুযার (ইবাদতকারী) বান্দারা সওয়াব পায় যেমন নামায পড়ার সওয়াব পায়। অর্থাৎ একথা বার বার বলা হয়েছে, সবাই জানে যে, উভয় প্রকার পুণ্যকর্ম হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদকে সমান্তরালে রোযার উপর রাখা হয়েছে।

তারপর বলা হয়েছে, সাদকা যেহেতু, অতএব সওয়াব ও সাদকার মত সওয়াব হবে। অপর একটি হাদিসে আছে যে, সাদকার সওয়াব সাতশ' গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এতো গেলো ভাল কথা বলা ভালোর জন্য কথা বলার এবং আপোষ রফা বা মীমাংসাকারীর সম্মানের কথা।

হযরত আবুল আব্বাস সাহ্‌ল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সঃ) খবর পেলেন

যে, বানী আমর বিন অওফ গোত্রের লোকদের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। আঁ-হযরত (সঃ) কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন। তাদের সমস্যার সমাধান করতে বেশ দেরী হয়ে গেল, নামাযের সময় হয়ে গেল। হযরত বেলাল (রাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, 'আঁ-হযরত (সঃ) বনী আমর বিন অওফ-এ মীমাংসার জন্য গিয়েছেন, এদিকে নামাযের সময় হয়ে গেছে আপনি কি নামায পড়িয়ে দিবেন? হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, 'যদি আপনারা বলেন তাহলে নামায পড়িয়ে দেব।" [বোখারী; কিতাবুল আযান]।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আঁ-হযরত (সঃ) সেখানে যথেষ্ট সময় দিয়ে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে (শান্তি প্রতিষ্ঠা) দেয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। নামাযের দেরী হওয়া সমস্যা নয়- পরেও বা-জামাত পড়া যাবে। নিশ্চয় নামায পরে পড়ার মত যথেষ্ট সময় ছিল তাই আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, 'ঠিক আছে, আমরা কয়েকজন নামায পড়ে নেব; যারা মসজিদে আছে তারা এখন পড়ে নিবেন। এখানে দু'জন মুসলমান যারা লড়াই ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছে তাদের মাঝে আপোষ করানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় বিবাদ মাসের পর মাস চলতে থাকে। বছরের পর বছর চলতে থাকে। কিন্তু একজন মোমেনের জন্য নির্দেশ এটাই যে, যতশীঘ্র সম্ভব সুলাহ (সন্ধি) করে ফেল।

আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয না যে, সে তিন দিনের বেশি কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে রাখবে বা কথাবার্তা বন্ধ রাখবে।' (বুখারী কিতাবুল আদব)। আশ্চর্য হতে হয়, অনেক সময় এমন কথা জানা শোনার পরও নিকট আত্মীয়রাও মাসের পর মাস কথাবার্তা বন্ধ রেখে কাটিয়ে দেয়। অথচ অসন্তুষ্টির কারণ খুবই তুচ্ছ একটি কথা হয়ে থাকে। এমন লোকদের উচিত আঁ-হযরত (সঃ)-এর হাদিসটি স্মরণ রাখা। আসলে ঝগড়া তো হওয়াই উচিত না। আর যদি কিছুই হয়েই যায়, তাহলে তিনদিনের বেশি সময় পার হওয়া উচিত না। কোন মোমেন তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখবে না।

হযরত আয়েশা রাযী আল্লাহুআনহা বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবচেয়ে খারাপ মানুষ সে যে সবচেয়ে বেশি ঝগড়া-বিবাদ করে।' [বুখারী;কিতাবুল আদব]। অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। সুতরাং প্রত্যেক আহমদী যেন তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রিয় হতে চেষ্টা করে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ফেৎনা ফাসাদ শেষ করে। মোমেনের এটা কাজ নয় যে, একদিকে ঈমানের দাবী করে অপর দিকে ভাইদের ত্রুটি ক্ষমা করে না। অন্যের ভুলগুলোকে ক্ষমা করতে পারে না। কারণ বলা হয়েছে যে, এমন লোকেরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবচেয়ে খারাপ বলে গণ্য হবে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ সম্পর্কে কি বলেছেন?

আঁ-হযরত (সঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয না যে, সে তিন দিনের বেশি কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে রাখবে বা কথাবার্তা বন্ধ রাখবে।'

হুযূর (আঃ) তাই বলেছেন, যা খোদাতাআলা বলেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ (আমাদের শিক্ষা ঃ পৃঃ ৬)–

"আল্লাহ্‌তাআলা চান, তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসুক। তিনি তোমাদের কাছ থেকে এক মৃত্যু চান যার পর তিনি তোমাদেরকে এক নতুন জীবন দান করবেন। যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইদেরকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সাথে বিবাদ মিটাতে প্রস্তুত নয় সে দুষ্ট। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হয়ে যাবে।"

আল্লাহ্ করুন আমরা সবাই যেন আমাদের নিজেদের মধ্যকার ছোট ছোট কটু কথা; বিরোধের কথা, ঝগড়া বিবাদ সব মীমাংসা করে ফেলি, শেষ করি, প্রত্যেকে যেন সন্ধির দিকে অগ্রসর হই। এটি একটি কঠোর সতর্কবাণী যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, সে সম্পর্কচ্যুত হবে। খোদা না করুন, কোন আহমদী যেন কর্তিত বা সম্পর্কচ্যুত না হয়। অতএব, এস্তেগফার করতে থাক; প্রত্যেক আহমদীর উচিত বেশি বেশি এস্তেগফার করতে থাকা। এবং এ দোয়া পড়তে থাকা ঃ

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বাদা ইযহাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্‌লা দুনকা রাহমাতান; ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯)।

অনুবাদ ঃ "হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর, নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।" হযরত (আঃ) আরো বলেছেন, "আমি সুলাহ্ সাফাই বা আপোষ রফা [মিটমাট করে ফেলা] পছন্দ করি এবং সুলাহ্ সাফাই বা মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর পূর্বের কথাগুলো আর মনে করতে হয় না যে, কে কি বলেছে, কে কি করেছে।" অর্থাৎ যখন কারো সাথে বিবাদ হয়েছিল তারপর সন্ধি হয়ে গেছে, এখন আবার তাদের মনে করানো উচিত না যে, কে কি বলেছে, কে কি করেছে। "আমি খোদাতাআলার কসম খেয়ে বলছি, কোন ব্যক্তি যে আমাকে হাজার বার দজ্জাল বলেছে, কায্‌যাব (মিথ্যাবাদী) বলেছে, আমার বিরুদ্ধে সবকিছু করেছে, তারপর যদি আমার সাথে সুলাহ্ (সন্ধি) করতে চায় তাহলে আমার একবারও মনে হয় না, হতে পারে না যে, সে আমাকে কি বলেছিল অথবা আমার সাথে কি ব্যবহার করেছিল। তবে আল্লাহ্‌র সম্মানের বিরুদ্ধে যেন হাত না তুলে। একথা সত্য কথা যে, যে ব্যক্তি চায় যে তার দ্বারা মানুষের কল্যাণ হোক, সে যেন বিদ্বেষ পোষণকারী না হয়। যদি সে বিদ্বেষ পোষণকারী হয় তাহলে তার দ্বারা মানুষের কি উপকার হতে পারে? অবস্থা যদি

খোদা না করুন, কোন আহমদী যেন কর্তিত বা সম্পর্কচ্যুত না হয়। অতএব, এস্তেগফার করতে থাক; প্রত্যেক আহমদীর উচিত বেশি বেশি এস্তেগফার করতে থাকা।

তার এমন হয় যে, যেই মাত্র তার নাফস বা ইচ্ছার বিপরীত কিছু ঘটে গেল সাথে সাথে সে প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়ে গেল। তার তো এমন হওয়া উচিত যে, হাজার বারও যদি তাকে ব্লেড (ফোঁড়া ইত্যাদি কাটার

যন্ত্র) দিয়ে আঘাত করা হয় তবুও সে ভ্রুক্ষেপই করবে না।"

হযরত (আঃ) বলেছেন ঃ

"আমার নসিহত এই যে, তোমরা দু'টি কথা স্মরণ রাখ। প্রথম, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, দ্বিতীয়ত নিজ ভাইদের সাথে এমন সহানুভূতি দেখাও যেমন তোমরা তোমাদের নিজেদের সাথে কর। যদি কারো দ্বারা কোন ত্রুটি বা ভুল হয়ে যায়, তাহলে তাকে ক্ষমা করা উচিত। এমন করা উচিত না তার উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং মনে মনে বিদ্বেষ পোষণের অভ্যাস কর।" [মলফুযাত; ৫ম খন্ড; ৬৯ পৃঃ)।

অনেক ঝগড়া বিবাদ এজন্য চলছে (মিটছে না) যে, অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূর হয় না। সুতরাং মীমাংসায় আসা খুই প্রয়োজন। অন্তরকে পরিষ্কার করা উচিত; প্রত্যেকের উচিত নিজেদেরকে বিদ্বেষমুক্ত করা।

হুযূর (আঃ) বলেছেন, এটা তখনই সম্ভব যখন তোমরা নিজ ভাইদের প্রতি এমন সদয় হও যেমন নিজেদের প্রতি হয়ে থাক। তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের কথা চিন্তা কর যেমন নিজেদের পাওনা পাওয়ার কথা চিন্তা কর। তাহলে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমাজ কায়েম হবে যেখানে কোন লড়াই ঝগড়া হবে না। সুলাহ (আপোষ) এর ভিত্তি স্থাপিত হবে। এবং সেখানে সুলাহ আর সূরাহ্-ই থাকবে।

হযরত (আঃ) লিখেছেন ঃ "পরস্পর সদ্ভাবের সাথে বসবাস করবে। সদ্ভাবেই মঙ্গল নিহিত। অন্যেরা শান্তি স্থাপন করতে চাইলে, তোমরাও শান্তির জন্য অগ্রসর হবে। খোদার পুণ্যবান বান্দাগণ শান্তির সাথে পৃথিবীতে চলেন। যদি তারা কারো মুখে কোন বৃথা কথা শোনে, যা সংঘাতের সূচনা করে এবং বিবাদের ভূমিকা হয়, তা হলে তারা গাম্ভীর্যের সাথে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে লড়াই আরম্ভ করে না।" অর্থাৎ যে পর্যন্ত অধিক কষ্ট দেয়া না হয়, হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হওয়াকে তারা ভালবাসে না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের পরিচয় লাভের এটাই নীতি। ছোট খাটো বিষয়কে কোন গুরুত্ব দিবে না। ক্ষমা করবে। ..." (ইসলামী উসুল কি ফিলোসফী। রূহানী খাযায়েন। ১০ খন্ড, পৃঃ ৩৪৯)।

আমি ইতোপূর্বেও বিভিন্ন খুতবায় বার বার বলেছি যে, হযরত (আঃ) এখানেও বলেছেন, অনর্থক কথাবার্তাকে গুরুত্ব দিতে হবে না। তাহলে সুলাহ (সন্ধি) কায়েম হবে। কারণ অনর্থক কথাবার্তা, গুনাহ্‌র কাজ, এসব কথা সুলহ্-এর থেকে দূরে এবং বিবাদের কাছে করে দেয়।

তারপর হযরত (আঃ) লিখেছেন– (ইসলামী নীতি দর্শন, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খন্ড; পৃঃ ৫৩, ৫৪) –

> "সুতরাং আমি আদেশ করছি- যারা আমার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে- তারা ওসব ধারণা পরিত্যাগ করবে। অন্তরকে পরিষ্কার করবে। নিজের ভেতরে যে মানবীয় করুণা বা দয়ার গুণ রয়েছে তাকে বাড়াতে থাকবে এবং যারা ব্যথা জর্জরিত মানুষ তাদের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করবে। পৃথিবীর বুকে সন্ধি প্রতিষ্ঠা করবে যেন আল্লাহ্‌র ধর্ম বিস্তার লাভ করে।"

"অকল্যাণ পরিহার সংক্রান্ত নৈতিক গুণের তৃতীয় অবস্থাকে আরবীতে 'হুদ্‌না ও 'হন' বলে। অর্থাৎ, অন্যের প্রতি যুলুম করে কাউকেও দৈহিক কষ্ট না দেয়া, নিরূপদ্রব মানুষ হওয়া এবং শান্তির সাথে জীবন যাপন করা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শান্তিপ্রিয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নৈতিক গুণ এবং এটা মানবতার জন্য অত্যাবশ্যক। এই নৈতিক গুণের উপযোগী মানব শিশুর মধ্যে যে প্রকৃতিগত শক্তি থাকে, যা সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে খুলক্ বা নৈতিক গুণে পরিণত হয়, তা হচ্ছে উলফত, অর্থাৎ সুশীলতা। ইহা সুস্পষ্ট যে, শুধু স্বভাবজ অবস্থায়, যখন মানুষের বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতার উন্মেষ হয় না, তখন সে শান্তি কি, বা সংঘাত কি, কিছুই বুঝতে পারে না। সুতরাং তখন তার মধ্যে মিলামিশার যে অভ্যাস পাওয়া যায়, তা-ই শান্তিপ্রিয়তা অভ্যাসের এক শিকড়। কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা এবং বিশেষ মননশীলতা দ্বারা পরিচালিত হয় না বলে তা খুলক্ বা নৈতিক গুণের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা নৈতিক গুণের অন্তর্ভুক্ত তখনই হবে, যখন মানুষ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা আপনাকে নিরূপদ্রব রূপে গড়ে তুলে শান্তিপ্রিয়তার নৈতিক গুণকে সঠিক পরিবেশে ব্যবহার করবে এবং অযৌক্তিক ব্যবহার হতে নিবৃত্ত থাকবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এ শিক্ষা দেন ঃ

অর্থাৎ, "পরস্পর সদ্ভাবের সাথে বসবাস করবে (৮ঃ২)। সদ্ভাবেই মঙ্গল নিহিত (৪ঃ১২৯)। অন্যেরা শান্তি স্থাপন করতে চাইলে, তোমরাও শান্তির জন্য অগ্রসর হবে (৮ঃ৬২)। খোদার পুণ্যবান বান্দাগণ শান্তির সাথে পৃথিবীতে চলেন (২৫ঃ৬৪)। যদি তারা কারো মুখে কোন বৃথা কথা শোনে, যা সংঘাতের সূচনা করে এবং বিবাদের ভূমিকা হয়, তা হলে তারা গাম্ভীর্যের সাথে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় (২৫ঃ৭৩) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে লড়াই আরম্ভ করে না।" অর্থাৎ যে পর্যন্ত অধিক কষ্ট দেয়া না হয়, হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হওয়াকে তারা ভালবাসে না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের পরিচয় লাভের এটাই নীতি। ছোটখাটো বিষয়কে কোন গুরুত্ব দিবে না। ক্ষমা করবে। এ আয়াতে 'লাগ্‌ব' শব্দ আছে। জানা আবশ্যক যে, আরবীতে লাগ্‌ব বলতে সেরূপ ক্রিয়াকলাপকে বলে, যেমন কোন ব্যক্তি কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে দুষ্টামি করে উস্কানিমূলক কথা বলে, যদ্বারা কোন প্রকৃত ক্ষতি হয় না। সুতরাং শান্তিপ্রিয়তার লক্ষণ এই যে, এই প্রকার বৃথা কষ্ট দানে ভ্রুক্ষেপ না করে গাম্ভীর্য অবলম্বন করা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

এ জামাতকে এজন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে যে, এদের নাক, কান, জিহ্বা (ভাষা) এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে যেন তাকওয়া প্রবেশ করে। এদের ভেতরে এবং বাইরে যেন তাকওয়ার নূর থাকে। উত্তম চরিত্রের উত্তম নমুনা হয়। অনর্থক রাগ বা ক্রোধ ইত্যাদি যেন একেবারেই না থাকে। আমি দেখেছি, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে রাগের ত্রুটি এখন পর্যন্ত রয়েছে। সামান্য কথাতেই হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং পরস্পর লড়াই ঝগড়া শুরু করে দেয়। এমন লোকদের জন্য জামাতে কোন অংশ নাই। আমি বুঝতে পারি না যে, যদি একজন অপরজনকে গালি দেয় এবং অপরজন গালি শুনে চুপ করে থাকে এবং জবাব না দেয় তাতে তার অসুবিধা কোথায়? প্রত্যেক জামাতের সংশোধন প্রথম তাদের চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে শুরু হয়। প্রথম থেকে ধৈর্যের সাথে তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) পেতে

থাকা উচিত, উন্নতি লাভ করতে থাকা উচিত। এর সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি এই যে, যদি কেউ গালমন্দ করে তাহলে আন্তরিক বেদনা সহকারে তার জন্য দোয়া করতে থাকা উচিত। যেন আল্লাহ্ তার সংশোধন করে দেন। কোন অবস্থাতেই তার সম্পর্কে অন্তরে বিদ্বেষকে যেন বৃদ্ধি পেতে না দেয়। যেমন পৃথিবীতে নিয়ম আছে তেমনই আল্লাহ্রও নিয়ম আছে। পৃথিবীর লোকেরা তো তাদের নিয়ম ভঙ্গ করতে সুযোগ দেয় না। আল্লাহ্তাআলা কেন তার নিয়ম ভঙ্গ করতে সুযোগ দিবেন? সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন সাধিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর নিকট তোমাদের কোন মূল্য নাই। আল্লাহ্তাআলা কখনও পছন্দ করে না যে, নম্রতা ধৈর্য এবং ক্ষমা করার মত উত্তম গুণের বদলে তোমাদের মধ্যে পশুত্ব বা হিংস্রতা বিরাজ করুক। যদি তোমরা এ সমস্ত ভাল ভাল চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন কর এবং এ ক্ষেত্রে উন্নতি কর, তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পার।" (মলফূযাত; ৪র্থ খন্ড; ৯৯ পৃঃ নতুন সংস্করণ)।

সুতরাং প্রত্যেকে নিজের প্রতি নজর দিবেন, হিসাব নিকাশ করবেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের সম্পর্কে যে রকম আশা করেছেন আমরা কি সে রকম হতে পেরেছি? না কি আমরা একে অপরের দিকে দেখছি এবং আশা করছি যে, তারা নিজেদের সংশোধন করেছি কি না এবং নিজের প্রতি নজর করছি না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"সুতরাং আমি আদেশ করছি- যারা আমার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে- তারা ওসব ধারণা পরিত্যাগ করবে। অন্তরকে পরিষ্কার করবে। নিজের ভেতরে যে মানবীয় করুণা বা দয়ার গুণ রয়েছে তাকে বাড়াতে থাকবে এবং যারা ব্যথা জর্জরিত মানুষ তাদের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করবে। পৃথিবীর বুকে সন্ধি প্রতিষ্ঠা করবে যেন আল্লাহ্র ধর্ম বিস্তার লাভ করে। এতে আশ্চর্য হয়ো না যে, কি করে হবে। কারণ আল্লাহ্তাআলা যেভাবে এ যুগে কোন উপকরণ ছাড়াই সাধারণ আসবাবকে কাজে লাগিয়ে মানুষের শারীরিক বা জাগতিক প্রয়োজন মিটাতে নতুন নতুন আবিস্কার ঘটিয়েছেন; পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করে ঘোড়ার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগামী রেলগাড়ি চালিয়েছেন; এমনই একজন মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের খাতিরে মানুষের হাতের সংস্পর্শ ছাড়াই আকাশের ফেরেশ্তাগণের সাহায্যে বড় বড় নিদর্শন প্রদর্শন করবেন। অনেক অনেক চমক সৃষ্টি হবে। যার ফলে অনেক মানুষের চোখ খুলে যাবে। তারপর একদিন মানুষ বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে মানুষকে যে খোদা বানানো হয়েছিল তা সব ভুল ছিল। কারণ আল্লাহ্ তাঁর তৌহিদের জন্য তোমাদের চেয়ে বেশি গায়রত বা অহংবোধ রাখেন। তোমরা দোয়ারত থাক। এমন না হয় যে তোমরা অবাধ্যদের মধ্যে গণ্য হও। হে তোমরা যারা সত্যের জন্য ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত। তোমরা শুনে রাখ, এ দিন এমন দিন যে সম্পর্কে একেবারে আরম্ভে প্রতিশ্রুতি দেয়া ছিল। খোদা ওসব কিস্সা কাহিনীকে বেশি দীর্ঘায়িত করবেন না। যেমন তোমরা দেখ যে, একটি উঁচু মিনারের উপর যদি প্রদীপ রাখা হয় তাহলে দূর দূরান্তে এর আলো ছড়িয়ে পড়ে; যেমন আকাশের এক প্রান্তে যদি বিদ্যুত চমকায় তাহলে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে যায়; তেমনই এযুগে হবে।" (রূহানী খাযায়েন; ১৭ খন্ড; ১৫-১৬ পৃঃ)

অতএব, আমাদের উচিত এ সমস্ত নসিহতের উপর আমরা যেন আমল করি। ঝগড়া-বিবাদ-ফাসাদ ব্যক্তিগত হোক, দলগত হোক, বা রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক, এর আসল কারণ এই যে, খোদাকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর জড় বস্তুসমূহকে খোদা বানানো হয়েছে। অতএব, আজ প্রত্যেক আহমদীকে চেষ্টা করতে হবে, প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, পৃথিবীতে সুলাহ [আপোষ মহব্বত]-এর ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে সুলাহ এবং সংস্কৃতি চালু করতে হবে এবং এর জন্য নকল খোদাকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এর মধ্যেই আমাদের অস্তিত্ব এবং আমাদের জীবন নির্ভর করছে। এরই জন্য আল্লাহ্ আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হে আল্লাহ্! আমাদের হৃদয় হেদায়াতের পরে যেন বক্র হয়ে না যায় এ দোয়া করে যেতে হবে। তারপরও আল্লাহ্র ফযলেই কেবল এটা সম্ভব। সুতরাং আল্লাহ্র ফযল চাইতে থাকবেন, তাঁর করুণা ভিক্ষা চাইতে থাকবেন, তাঁর আদেশ নির্দেশ মেনে চলতে চেষ্টা করতে থাকবেন। তারপর তাঁর ফযলের (অনুগ্রহ) অপেক্ষা করবেন। দেখবেন, খোদা কিভাবে আসেন। এবার শেষে আর একটি উদ্ধৃতি পড়ে শোনাচ্ছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নসিহত করে বলেছেন ঃ

"সুতরাং জাগ্রত হও এবং তওবা কর (অনুতাপ কর) এবং পুণ্যকর্ম দ্বারা নিজের মালিককে সুন্তুষ্ট কর। মনে রেখো, ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত ভুল ভ্রান্তির শাস্তি মৃত্যুর পর দেয়া হবে, এবং হিন্দু খ্রীষ্টান কিংবা মুসলমান হবার বিচার কিয়ামতের দিনই হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যাচার অনাচার এবং অশ্লীল কুকর্মে সীমালংঘন করে তাকে এখানেই শাস্তি প্রদান করা হয়। কোনক্রমেই সে তখন খোদার শাস্তি থেকে পালাতে পারে না। সুতরাং নিজ খোদাকে অবিলম্বে সন্তুষ্ট কর এবং সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির আগমনের পূর্বে তোমরা খোদার সাথে সন্ধি কর-যার সংবাদ নবীগণ দিয়ে গেছেন। তিনি অতীব দয়ালু। অশ্রুসিক্ত হয়ে এক মুহূর্তকালের তওবার ফলে সত্তর বছরের পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তওবা কবুল হয় না একথা বল না।" এখানে সত্তর বছরের পাপ ক্ষমার অর্থ লায়লাতুল কদরের কথা। **"মনে রেখো, তোমাদের কর্ম দ্বারা কখনই তোমরা বাঁচতে পারবে না- চিরদিন আল্লাহ্র ফযলই (অনুগ্রহ) রক্ষা করে- মানবের কর্ম নয়। হে পরম করুণাময়! দয়াময় খোদা! আমাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ কর। কেননা আমরা তোমার বান্দা তোমার দরবারে বিনত হয়েছি।"** (লেকচার লাহোর, পৃঃ ৩৯) আল্লাহ্ আমাদেরকে শক্তিদান করুন, আমীন।

[আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ১লা অক্টোবর, ২০০৪ইং]।

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

জামাতের কর্মকর্তা এবং সাধারণ সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক

[হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪ইং তারিখে ফ্রান্সে খুতবাটি প্রদান করেন]

আল্লাহ্তাআলা হযরত আকদাস মসীহে মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মৃত্যুর পর এই ঐশী জামাতে খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে আমাদের প্রতি একটা বড় অনুগ্রহ করেছেন। এই খেলাফত ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে জামাতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তা যত ক্ষুদ্রই হোক, স্থানীয় বা শহরের জামাত হোক কিংবা দেশীয় পর্যায়ের জামাতই হোক সমস্ত ব্যবস্থাপনা আবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ স্থানীয় জামাত যত ক্ষুদ্রই হোক তার প্রেসিডেন্ট থেকে আরম্ভ করে দেশীয় জামাতের আমীর পর্যন্ত সরাসরি অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মধ্যস্থতায় যুগ খলীফার সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকেন। এছাড়া প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তিগতভাবে যুগ-খলীফার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। জামাতের প্রত্যেক সদস্য যুগ-খলীফার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। কোন ক্ষেত্রে জামাতের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ-অনুযোগ যুগ খলীফাকে জানাতে চাইলে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও সদস্যদেরকে তা আমীরের মাধ্যমেই যুগ-খলীফার কাছে উপস্থাপন করা উচিত। আর দেশীয় আমীরের কর্তব্য হলো, সেই নালিশ তাঁর বিরুদ্ধে হলেও তিনি যেন তা খলীফার কাছে প্রেরণ করেন। কোন ব্যাখ্যা বা উত্তর দেয়ার থাকলে তিনি যেন সেটাও একই সঙ্গে প্রেরণ করে দেন যাতে পত্র আদান-প্রদানে বাড়তি সময় নষ্ট না হয়। অভিযোগকারীর দায়িত্ব হলো, ব্যক্তিগত আক্ষেপের কারণে কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সময় তিনি যেন এটাকে জামাতীয় রূপ না দেন। খোদাভীতি ও তাকওয়ার আলোকে যেন তিনি একাজটি করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, জ্ঞানের অভাব রয়েছে বা যাদের মাঝে পার্থিবতা প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে তারা এমন সব কথাবার্তা বলে ফেলেন যা ঐশী জামাতের মর্যাদা ও রীতি বিরুদ্ধ হয়ে থাকে। এ ধরনের দুর্বল বা স্বল্প জ্ঞানীদেরকে আমি এ ধরনের গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছি।

কর্মকর্তাদেরকে আপনারা নির্বাচনের মাধ্যমে বাছাই করে থাকেন। সাধারণভাবে জামাতে এই পদ্ধতিই কার্যকর। তবে বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে কোন

কোন ক্ষেত্রে মনোনয়ন প্রদান করার কথা ভিন্ন। সেই মনোনয়ন কিন্তু কেন্দ্র কিংবা যুগ-খলীফার অনুমোদন সাপেক্ষেই হয়ে থাকে। যাই হোক, এ নির্বাচন যখন সংখ্যা গরিষ্ঠদের মতামতের আলোকে একবার সম্পাদিত হয়ে যায় তখন কিন্তু দ্বিমত পোষণকারী ভোটারেরও দায়িত্ব বর্তায় সে যেন নির্বাচিত কর্মকর্তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে। জামাতের প্রতিটি সদস্য এ শিক্ষার উপর আমল করলে গোটা জামাতটি একটি সীসা গলিত প্রাচীরের রূপ ধারণ করতে পারে। এই জামাত একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হতে পারে।

> পদের দায়িত্ব এমন লোকদেরকে দাও, এমন লোকদেরকে নির্বাচিত কর যারা সেই নির্দিষ্ট কাজের বিষয়ে যোগ্যতা রাখেন। অর্থাৎ যে পদের জন্য তাদেরকে বাছাই করা হচ্ছে তারা যেন সে কাজ করার দক্ষতা / যোগ্যতাসম্পন্ন হন আর এর জন্য সময় দিতে পারেন।

আমি জামাতের কোথাও এ ধরনের আভাস বা সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে এ কথাগুলো বলছি না (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেকা)। আমার উদ্দেশ্য অন্য, আমি একটু আগেই বলেছি, কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের বা পার্থিবতায় আসক্তির কারণে এ ধরনের কথাবার্তা বলে ফেলেন আর এ জামাতে নতুন প্রবেশকারী সদস্যরা তাদের কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে পড়েন। এছাড়া, এসব কথা নব-দীক্ষিতদের আত্মিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যও জানানো আবশ্যক। নতুনদেরকে এদের তরবীয়তের জন্য এসব কথা আর কর্মকর্তাদের দায় দায়িত্ব সম্বন্ধে জানানো প্রয়োজন। কেননা, নতুনদের মনে জামাতের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের জন্ম হয়ে থাকে।

যাই হোক, ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এখন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর জামাতে খিলাফত ব্যবস্থার সাথে এসব ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহ্তাআলার কৃপায় বর্তমানে এই ব্যবস্থাপনা পৃথিবীতে দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কোন শত্রু বা বিরোধী এখন এর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজেদেরকে সচেতন রাখার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে এসব বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে যাওয়া উচিত। যেন পুরনো আহমদীদের মস্তিষ্কে এসব কথা বিদ্যমান থাকে। এর পাশাপাশি নতুন বয়আতকারীরাও যেন এথেকে লাভবান হয়। কারও মনে কখনো যেন অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়।

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে প্রথমে আমরা পবিত্র কুরআন থেকে দিক-নির্দেশনা নিয়ে জানবো, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে নিজেদের কর্মকর্তাদের বাছাই করার বিষয়ে কি বলেছেন। আমি কুরআনি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এতে আল্লাহ্তাআলা বলছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আমানতসমূহ এদের যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করার আদেশ দিচ্ছেন, আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে শাসন কাজ পরিচালনা কর পূর্ণ ন্যায় নিষ্ঠার সাথে তা পরিচালনা করবে। আল্লাহ্তাআলা তোমাদেরকে কী চমৎকার উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা গভীর দৃষ্টিপাতকারী।

প্রথম কথা কর্মকর্তা নির্বাচনকারীদের বলেছেন, পদের দায়িত্ব এমন লোকদেরকে দাও, এমন লোকদেরকে নির্বাচিত কর যারা সেই নির্দিষ্ট কাজের বিষয়ে যোগ্যতা

রাখেন। অর্থাৎ যে পদের জন্য তাদেরকে বাছাই করা হচ্ছে তারা যেন সে কাজ করার দক্ষতা / যোগ্যতাসম্পন্ন হন আর এর জন্য সময় দিতে পারেন। ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক আছে বলে কাউকে কোন পদের জন্য নির্বাচন করতে হবে এমন কোন শিক্ষা নেই। এক্ষেত্রে নির্বাচনকারীর বা রায় প্রদানকারীর কাঁধে একটি বড় দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে তাই ভোটাধিকার প্রদান করার দায়িত্ব দেয়া হয় না। নিয়মানুযায়ী যারা ভোট প্রদানের যোগ্য হয়ে থাকেন তাদের একটা বড় দায়িত্ব হলো তারা যেন দোয়া করে ভোট দেন। তারা যেন যোগ্য কোন ব্যক্তিকেই ভোট প্রদান করেন।

প্রাসঙ্গিকভাবে একটা কথা বলে রাখি, কখনো কখনো কোন কোন ব্যক্তির নির্বাচিত হবার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়ে থাকে। তাই, এ প্রসঙ্গে হঠকারিতা দেখা উচিত নয়। **এ কথা বলা সমীচীন নয়, অমুক যোগ্য ব্যক্তিকে আমরা ভোট দিতে চাচ্ছি তাই তার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হোক, তা না হলে আমরা নির্বাচনে অংশ নিব না। এটা ভুল পন্থা।** আনুগত্যের দাবী হলো জামাতী ব্যবস্থাপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী হচ্ছে, কারও নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়ে গিয়ে থাকলে সে বিষয়ে হঠকারিতা প্রদর্শন করা যাবে না।

আরেকটা প্রাথমিক কথা স্পষ্ট করে বলে দেই। আপনারা হয়তো চিন্তাগ্রস্থ হয়ে যাচ্ছেন, লোকেরা জল্পনা-কল্পনা করা আরম্ভ করে দিবেন। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, যেহেতু আমার এই খুতবা ফ্রান্সে প্রদান করা হচ্ছে, নিশ্চয় ফ্রান্সের জামাতেই বুঝি এমন ঘটনা ঘটে থাকবে। আপনাদের স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি, এখানে এমন কোন ঘটনা ঘটে নি। আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে এটি একটি বড়ই নিষ্ঠাবান জামাত। আমার জানা মতে, ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত জামাতসমূহে এটির অসাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর মধ্যে পাকিস্তানী ORIGIN ও অপাকিস্তানী ORIGIN সদস্যদের আনুপাতিক হার যথাক্রমে ৬০ঃ৪০। যে গতিতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জামাতের মাঝে নতুনরা প্রবেশ করছে এর কারণে আগামী কয়েক বছরে এ জামাতের পাকিস্তানীদের হার কমে গিয়ে অন্যদের হার অনেক বৃদ্ধি লাভ করাটা অসম্ভব কিছু নয়। আর বিদেশীদের মাঝ থেকে এ পর্যন্ত যারাই আহমদী হয়েছেন (বিদেশী বলতে ফ্রান্সে বসবাসকারী অন্যান্য দেশের লোকদের কথা বলছি) তারা কেবল নামের আহমদী নন। বরং আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে তারা জামাতী ব্যবস্থাপনার নিয়মিত অংশীদার হয়ে গেছেন। এবার বার্ষিক জলসার সময়েও দেখা গেছে, তাঁরা বড় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন। এরা জামাতের উন্নতিকল্পে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। মহান আল্লাহ্‌ এদেরকে ঈমান ও আন্তরিকতায় আরও উন্নত করুন(আমীন)। তাই আমি বলে দিচ্ছি, ফ্রান্সে এমন অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। পাশ্চাত্যের আরেকটি দেশের একটি শহরের জামাতের এধরনের প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। উন্নতিশীল কোন জাতি নিজেদের দুর্বলতার বিষয়ে ঔদাসিন্য দেখাতে পারে না। তাই আমি আজকে এই বিষয়টা মনোনীত করেছি যেন দুর্বলদের সম্বোধনের পাশাপাশি নতুন আহমদীদের তরবিয়তের কাজটাও হয়ে যায়। একই সাথে জামাতের সদস্যরা তাদের এই দুর্বল ভাইদের ঈমানী উন্নতি ও দৃঢ়তার জন্য দোয়া করার সুযোগও যেন লাভ করেন।

নির্বাচনকারী আর নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ উভয় পক্ষকে মনে রাখতে হবে, জামাতের কোন পদ বা দায়িত্ব কারও জন্মগত অধিকার নয়, স্থায়ী কোন অধিকার নয়।

আমি বলেছিলাম, জামাতের বিধান অনুযায়ী যাদেরকে ভোটাধিকার প্রদানের যোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে এমন প্রত্যেক সদস্যের প্রতি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত একটি দায়িত্ব বর্তায়। আর তা হলো, তারা যেন ভেবে চিন্তে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেন। নির্বাচনকারী আর নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ উভয় পক্ষকে মনে রাখতে হবে, জামাতের কোন পদ বা দায়িত্ব কারও জন্মগত অধিকার নয়, স্থায়ী কোন অধিকার নয়, (দীর্ঘকাল সেবা করার কারণে কারও মন মানসিকতায় এই ভুল চিন্তা আসতেও পারে)। অতএব, সেবার যে সুযোগ মানুষ লাভ করে এটি নিছক আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহ বিশেষ। আর যে জিনিস নিছক আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে পাওয়া– আল্লাহ্‌তাআলা নিজে তা দান করে থাকেন, তাই কোন পদের জন্য কেউ যেন লালায়িত না থাকে। **তাই কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইঙ্গিতেও যেন আমাকে কর্মকর্তা নির্বাচিত কর এমন কোন আভাস পাওয়া না যায়। কোন ব্যক্তির আত্মীয় বা স্বজনদের তার পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য ইঙ্গিতে বা অন্য কোন উপায়ে এ ধরনের বহিঃপ্রকাশ করার কখনও অনুমতি নেই। এ ধরনের কথা যদি জামাতের ব্যবস্থাপনা জানতে পারে তাহলে যার সপক্ষে নির্বাচনের পূর্বে প্রচারণা চালানো হয়েছে তাকে আর যারা প্রচারণা চালিয়েছে তাদেরকেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বিরত রাখা যেতে পারে এবং এমনটিই করা হয়ে থাকে।** অতএব, জামাতী নির্বাচনগুলোকে কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্মী বাহিনী বাছাই করার ব্যবস্থা মনে করে সম্পাদন করা উচিত।

অপরপক্ষে, নির্বাচিত কর্মকর্তাদের জন্যও আল্লাহ্‌তাআলা দায়িত্ব নির্বাচন করেছেন। আর তা হলো, তোমাদেরকে যখন নির্বাচিত করা হয় তখন এ দায়িত্বটিকে একটি জাতীয় আমানত হিসেবে গণ্য করবে। প্রদত্ত দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। নিজেদের সমস্ত কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা ব্যয় করে এই দায়িত্ব পালন করবে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য সময় দিবে। জামাতের উন্নতি সাধনের জন্য নতুন নতুন পথ ও পন্থা অনুসন্ধান করবে। তোমাদের কার্যকলাপ ও সিদ্ধান্তগুলো যেন ন্যায়সঙ্গত এবং পক্ষপাতিত্বমুক্ত হয়। তোমাদের 'আমিত্ব' বা আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক যেন তোমাদেরকে কখনও ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। কারও মনে যেন কখনও একথা না থাকে, অমুক ব্যক্তি আমাকে ভোট দেয়নি অথবা আমার পদের জন্য অমুকের নামও প্রস্তাব হয়েছিল, অতএব, যখনই সুযোগ পাবো আমি তাকে বিরক্ত করবো–এটা বিশ্বাসী মুমেনের মনোভাব হতেই পারে না। বরং এটি হবে চরম হীনমন্যতার পরিচায়ক।

এরপর আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন ঃ তিনি তোমাদেরকে যে উপদেশ প্রদান করেছেন সেটা উভয় পক্ষের জন্যই অর্থাৎ ভোটাধিকার প্রয়োগকারী এবং নির্বাচিত কর্মকর্তাদের জন্য বড়ই চমৎকার একটি উপদেশ। উপদেশটি হলো, ভোটদাতা যেন

চিন্তা-ভাবনা করে ভোট দেয়ার যে নির্বাচিত হয় সে যেন তার যথাসাধ্য যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে সেই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়। দোয়া করি, আল্লাহ্‌তাআলা যেন আমাদের প্রত্যেক কর্মকর্তাকে তিনি জামাতের কর্মকর্তা হোন বা কোন অঙ্গ-সংগঠনের কর্মকর্তাই হোন সবাই যেন নিজ দায়-দায়িত্ব বুঝে তদানুযায়ী ন্যায়পরায়ণতার সাথে কার্যনির্বাহ করার সৌভাগ্য দান করেন (আমীন)।

পরিশেষে নির্বাচিত কর্মকর্তা ও জামাতের সাধারণ সদস্যদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এসব কাজ করার পরও দোয়ায় রত থেকো। **প্রত্যেক কর্মকর্তা ন্যায়-নীতি অবলম্বন করার পাশাপাশি আল্লাহ্‌তাআলার কাছে দোয়া করবেন যেন তিনি তাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার সৌভাগ্য দান করেন। আর জামাতের প্রত্যেক সদস্য দোয়া করবেন, যারা কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন তারা যেন সবসময় এই আমানতের প্রতি যথাযোগ্য দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। এমন কোন সমস্যা বা পরীক্ষা যেন কখনও দেখা না দেয় যা কর্মকর্তা বা সদস্যদের জন্য পদস্খলনের কারণ হয়।** আল্লাহ্‌তাআলার দৃষ্টিতে যদি সদস্যদের নির্বাচিত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে অক্ষম বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে জামাতের ব্যবস্থাপনাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তাআলা তাকে পরিবর্তন করার জন্য নিজেই ব্যবস্থা করে দিবেন। আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন, তোমরা উভয় পক্ষ এভাবে দোয়া করলে তোমাদের আন্তরিকতাপূর্ণ দোয়া তিনি কবুল করবেন। কেননা আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর ধর্মের সেবায় নিয়োজিত কর্মীদের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে থাকেন। তিনি সর্বদা তাদেরকে দেখছেন ও তাদের অন্তরের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত। তোমাদের মনের ব্যথা উপলব্ধি করে তিনি সবসময় তোমাদের জন্য কল্যাণজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আর তোমাদেরকে সীসা গলিত প্রাচীরের মত দৃঢ়তা দান করে যাবেন। আল্লাহ্‌তাআলা সবাইকে সব ধরনের পদস্খলন থেকে রক্ষা করুন। (আমীন)

এখন আমি বিস্তারিতভাবে বলবো, কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব কি আর জামাতের সদস্যদের সাথে তাদের কী ধরনের আচরণ করা উচিত। জামাতের সদস্যদের পক্ষ থেকে কর্মকর্তাদের প্রতি কি ধরনের আচরণ হওয়া উচিত সে কথাও আমি বলবো।

কর্মকর্তাদেরকে স্পষ্টভাবে একটি নীতিগত নির্দেশ কুরআন শরীফ প্রদান করেছে। আর তা হলো, পূর্ণাঙ্গভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেউ যদি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে দেখে ন্যায় প্রতিষ্ঠার চাহিদা কি এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি তাহলে দেখা যাবে সমস্ত কথাই এর মাঝে বলে দেয়া হয়েছে। একটিও বাদ দেয়া হয়নি। কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যক্তি এত গভীরভাবে বিষয়টিকে নিয়ে চিন্তা করে না। তাকওয়ার সূক্ষ্মতা নিয়ে কেউ যদি বিষয়টিকে নিয়ে ভাবে তাহলে পূর্ণ ন্যায় প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেই সে নিজেকে নিঃশেষ করতে পারে। কিন্তু উপদেশ প্রদান যেহেতু সম্পদের জন্য উপকারী আর আমি আগেই বলেছি এ ধরনের বিষয় বার বার স্মরণ করানো উচিত এতে অনেক বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা লোকেরা জানতে পারে। তাই এই প্রসঙ্গটিকে আরও বিস্তারিতভাবে

> *আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন, তোমরা উভয় পক্ষ এভাবে দোয়া করলে তোমাদের আন্তরিকতাপূর্ণ দোয়া তিনি কবুল করবেন। কেননা আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর ধর্মের সেবায় নিয়োজিত কর্মীদের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে থাকেন।*

খুলে বলার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথম কথা হলো, কর্মকর্তারা মনে করবেন, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলেছেন ঃ 'ওয়াল কাযেমীনাল গায়যা ওয়াল আকীনা আনিন নাস।'। অর্থাৎ মুমিনরা ক্রোধকে দমনকারী আর মানুষের ভুলত্রুটি ক্ষমাকারী হয়ে থাকেন। কর্মকর্তারা নিজেদেরকে এই শিক্ষার সবচেয়ে প্রধান সম্বর্ধিত শ্রেণী মনে করবেন। কেননা, জামাতে তাদের যে অবস্থান রয়েছে, জামাতের সম্মুখে তাদের যে আদর্শ স্থাপন করা উচিত তদানুযায়ী তাদের উচিত তারা পূর্ণাঙ্গভাবে নিজেদেরকে যেন বিনয়ী বানান। সমাজের কারো সংশোধন করার উদ্দেশ্যে তার কাছে যদি ক্রোধের বহিঃপ্রকাশও করতে হয় তাহলে যাকে বলার তাকে নিভৃতে পৃথক বৈঠকে রাগ দেখানো যেতে পারে। জনসমক্ষে কারও সম্মান ক্ষুণ্ন করা মোটেও উচিত নয়। নিজেকে যেন খিটখিটে স্বভাবের মানুষ কেউ সাব্যস্ত না করে। কোন প্রকার অহংকারও যেন প্রদর্শিত না হয়। ক্ষেপে গিয়ে কারো সংশোধন করা যায় না। বরং স্থিরচিত্তে ব্যথিত অন্তর নিয়ে, দোয়ার মাধ্যমে উপদেশ দিতে থাকলে সংশোধন করা সম্ভব। এটাই আল্লাহ্‌তাআলার শিক্ষা। যদি কেউ অপরাধে অভ্যস্থ না হয়ে থাকে তাহলে একবার বা দু'বারের ভুল ত্রুটি মার্জনা ও ক্ষমা করা সংশোধনের সর্বোত্তম পন্থা। অতএব, এখানেও অর্থাৎ ফ্রান্সে কিংবা বিশ্বের যে যে স্থানে জামাত প্রতিষ্ঠিত জামাতের এবং অঙ্গ সংগঠনের কর্মকর্তাদের আচরণে একটা পরিবর্তন সাধন করুন। মানুষের সাথে স্নেহ ও ভালবাসার আচরণ করুন। বিশেষ করে, কয়েকটি স্থানে লাজনা সদস্যদের পক্ষ থেকে অনুযোগ অভিযোগ পাওয়া যায়। আর এদের মাঝ থেকেও বিশেষভাবে উঠতি বয়সী মেয়েদের এবং নব-দীক্ষিত আহমদী মহিলাদের পক্ষ থেকে (যারা জামাতের ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখেন না) এ কথা শোনা যায়। এদের তরবীয়তের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তাই এদের প্রতি অনেক বেশি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কেননা, কোমলমতি সদস্যদের বা নব-দীক্ষিতদের তরবীয়তের ক্ষেত্রে আপনারা যে ধরনের চিত্র তাদের মানসপটে এঁকে দিবেন ভবিষ্যতের প্রজন্ম সে ধরনেরই তৈরী হবে, ভবিষ্যত কর্মকর্তা/কর্ত্রীও সেরকমই প্রস্তুত হবে। আমার কথার সারাংশ হলো– ক্রোধ সংবরণ করতে হবে আর ক্ষমাসুন্দর আচরণ অবলম্বন করতে হবে। ত্রুটি-মার্জনার স্বভাব গড়তে হবে। তবে এ নম্রতা ও বিনয় যেন আবার জামাতের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার মত পর্যায়ে না যায়। এ ধরনের প্রবণতা থাকলে অবশ্যই সংশোধনমূলক ব্যবস্থা করতে হবে– আমি আগেই বলেছি। যারা অভ্যস্থ অপরাধী নন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার মাধ্যমেও সংশোধন করা সম্ভব নয়; কিন্তু জামাতে যদি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে ক্ষমার অবকাশ থাকে না। কেবল তাই নয়। যদি জামাতী শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ হয় সেক্ষেত্রে কেবল স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই যথেষ্ট হবে না বরং এ বিষয়ে কেন্দ্রকেও অবহিত করতে হবে। আবার কঠোরতা এমন মাত্রাতিরিক্তও যেন না হয়। আমি

একটু আগেই বলেছি, উঠতি বয়সী সদস্যরা বা নব-দীক্ষিতদের মনে আবার ধর্মের প্রতিই যেন অনীহা বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়।

কর্মকর্তাদের মাঝে নিজের বিরুদ্ধে নালিশ বা অভিযোগ সহ্য করার মানসিকতা ও উদারতা থাকতে হবে। সর্বদা সত্য কথা বলার, বলতে দেয়ার আর সত্য কথা শোনার অভ্যাস গড়ে তুলুন। একজন মানুষ আপনার যত কাছের আত্মীয় বা বন্ধুই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধেও যদি কোন অভিযোগ আপনার কাছে আসে তখন তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আপনারা যদি ন্যায়-নীতির এই মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করাই উত্তম। স্পষ্ট বলে দিন, অমুক কারণে আমি অপারগতা প্রকাশ করছি। কেননা কোন একক ব্যক্তির একটি দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়াটা গোটা জামাতে বা জামাতের একটি অংশে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে দেয়া থেকে উত্তম। মনে রাখবেন জামাতী বা সাংগঠনিক যে পদ-ই আপনারা লাভ করেছেন–একে আল্লাহ্তাআলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ মনে করবেন। একে আপনার অধিকার মনে করবেন না। একবার যে একটা পদে সেবা করার সুযোগ লাভ করে তার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে– জাতির সেবক হিসেবে বাস্তবে সেবা প্রদান করতে হবে। কেবল মুখে মুখে দু'চারজনের সামনে আমি আপনাদের সেবায় নিয়োজিত একথা বললে চলবে না। বরং বাস্তবে আপনার প্রতিটি কাজে ও কথায় যেন আপনার সেবামূলক মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে। আপনাদের আচরণ ও কাজ কর্ম যদি এমনটা না হয় তবে নির্ঘাত জবাবদিহি করতে হবে। যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন না করলে একদিন অবশ্যই হিসেব দিতে হবে।

- হাদিসে একটি বর্ণনা– হযরত মাকাল বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেছেন, আমি মহানবী (সঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছিঃ **"আল্লাহ্তাআলা যাকে মানুষ / সমাজের তদারককারী ও দায়িত্বশীল বানিয়েছেন সে যদি মানুষের তদারকী ও নিজ দায় দায়িত্ব পালনে আর তাদের মঙ্গল কামনায় উদাসীনতা দেখায় তাহলে তার মৃত্যুর পর আল্লাহ্তাআলা তার পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিবেন আর তাকে জান্নাত দান করবেন না।"** লক্ষ্য করে বলুন, এই শতর্কবাণী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কে জামাতী দায়িত্ব ও পদ লাভ করার জন্য লোভ দেখাতে পারে। এই দায়িত্ব ও পদ প্রকৃত পক্ষে এমন ভীতিপ্রদ একটি বিষয়, যদি কেউ সত্যিকার অর্থে এ সত্য অনুধাবন করতে পারে তাহলে ভয়ে সে শিহরিত হতে থাকবে। অতএব, কর্মকর্তারা তাদের প্রতি এই ঐশী অনুগ্রহের কদর করুন আর নিজেদের দায়দায়িত্ব পালন করুন, যথাযথভাবে সেগুলো পালন করুন। আল্লাহ্তাআলার ক্রোধ লাভ করার স্থলে তাঁর ভালবাসা অর্জনে সচেষ্ট হন।

কর্মকর্তাদের মাঝে নিজের বিরুদ্ধে নালিশ বা অভিযোগ সহ্য করার মানসিকতা ও উদারতা থাকতে হবে। সর্বদা সত্য কথা বলার, বলতে দেয়ার আর সত্য কথা শোনার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

- আরেক হাদিসের বর্ণনা আছে। হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ "কিয়ামত দিবসে মানুষের মাঝে আল্লাহ্র অধিক প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবে ন্যায়পরায়ণ শাসক। একই সাথে সবচেয়ে ঘৃণ্য আর সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হবে অত্যাচারী শাসক। তাই ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে সবাইকে আল্লাহ্তাআলার প্রিয় পাত্র হবার চেষ্টা করা উচিত। আর আল্লাহ্তাআলার প্রিয় পাত্র হবার জন্য সেসব পথ ও পন্থা অবলম্বন করুন যা আল্লাহ্র প্রিয় রসূল (সঃ) আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন।

আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। "আবু হাসান বর্ণনা করেছেন, আম্র বিন মুররা হযরত মুয়াবিয়াকে বলেছেন, আমি মহানবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে নেতা অভাবী, অসহায় ও দরিদ্রদের জন্য তার দরজা বন্ধ করে রাখে আল্লাহ্তাআলাও তার প্রয়োজন মেটানোর আকাশের দরজা বন্ধ করে দেন।" মহানবী (সঃ)-এর এই শিক্ষা শোনার পর হযরত মুয়াবিয়া মানুষের চাহিদা সমস্যা সমাধান ও তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য এক ব্যক্তিকে পৃথক নিয়োগ দান করেন। অতএব, মানুষের মনে নিজেদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করুন। নিজেদের ভাইদের ও বোনদের সাথে আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তাঁর প্রিয় পাত্র হবার জন্য ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করুন। আমীর, প্রেসিডেন্ট, জামাতী ও সাংগঠনিক কর্মকর্তারা মনে রাখবেন, তারা যুগ খলীফা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কার্যনির্বাহী ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। আর এই আঙ্গিকে তারা যুগ-খলীফার প্রতিনিধি। তাই তাদের নিজেদের কাজ ও দায়িত্ব পূর্ণ করার ক্ষেত্রে তাদের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে সেভাবেই প্রবাহিত হওয়া উচিত যেভাবে যুগ-খলীফার চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছে। আর সে সব নিদের্শনা পালন করা তাদের দায়িত্ব যা কেন্দ্র থেকে তাদেরকে প্রদান করা হয়। যদি বাস্তবে এমনটা না করেন তবে আপনারা আপনাদের পদের দায়-দায়িত্ব পূর্ণ করছেন না, এর প্রতি সুবিচার করছেন না।

আরেকটি বিষয় রয়েছে। আর তা হলো পদের জন্য আকাঙ্ক্ষা। এ বিষয়ে আমি আগেই বলে এসেছি। এই প্রবণতাকে জামাতের নামে বড়ই দোষণীয় মনে করা হয়। আর প্রত্যেক এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে যে পদ লাভে সচেষ্ট হয়।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সঃ) আমাকে বলেছেন, "হে আব্দুর রহমান! তুমি নেতৃত্ব ও ক্ষমতা চেয়ো না। না চাইতে তুমি যদি এই পদ লাভ কর সেক্ষেত্রে এই দায়িত্ব পালনে তোমাকে সাহায্য প্রদান করা হবে অর্থাৎ লোভ লালসা ছাড়া যদি কোন পদ মানুষ লাভ করে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাঁকে সাহায্য করেন। আর তোমার চাওয়ার কারণে তোমাকে যদি পদ প্রদান করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তুমি আল্লাহ্তাআলার ধরা-ছোঁয়ার আওতাধীন হয়ে যাবে (অর্থাৎ সামান্য ভুল ত্রুটি হলেও কঠোরভাবে ধরা হবে)। আর তুমি যখন একটা কাজ করা বা না করার বিষয়ে কসম খেয়ে ফেল আর পরে তোমার কসমের পরিপন্থী উত্তম কোন পথ তুমি দেখতে পাও তখন অধিক উত্তম পন্থাটি অবলম্বন কর এবং পূর্ববর্তী কসমটি ভেঙ্গে ফেলে এর কাফফারা আদায় করে দিও।" এটাই শিক্ষা। কখনও কখনও কর্মকর্তারা কসম না খেলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তারা একরোখা

মনোভাব রাখতে পারেন। অর্থাৎ কাজটা এভাবে নয় ওভাবে করা উচিত হবে। কিন্তু জামাতের উপকারের বা কল্যাণের চেয়ে আপনাদের একরোখা সিদ্ধান্ত বা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি জামাতের সাথে নতুন কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে আগের একরোখা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন আর তাকওয়ার আলোকে সে কাজটি করুন যা জামাতের স্বার্থ রক্ষার্থে সর্বোত্তম।

হাদিসে আরেকটি শিক্ষা পাওয়া যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) বলেছেন, "স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করো, মানুষের জন্য কাঠিন্য সৃষ্টি করো না। আর সুসংবাদ দিও আর মানুষদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলো না।" নীতিগত শিক্ষাগুলোর উদ্দেশ্য হলো, সঠিক দিকে অগ্রসর হওয়ার পাশাপাশি মানুষের জন্য যেন স্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করা যায়। তোমাদের একরোখা মনোভাব, তোমাদের শপথ, তোমাদের আমিত্ব ভাল ও উপকারী কাজ সম্পাদনে যেন বাধার সৃষ্টি না করে। এমন কাজ করো না যার জন্য মানুষ বিরক্ত হয়। কোন পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের কারণে যদি সাধারণ মানুষ বিরক্ত বোধ করছে বা কষ্ট পাচ্ছে এমন হয়, তাহলে তা পরিবর্তন করা যেতে পারে। ন্যায় নীতির আরেকটি দাবী আছে। আর তা হলো, তোমাদের কাছে মানুষ যেন সবসময় আনন্দের ও ভালবাসার বাণী শোনার জন্য সমবেত হতে পারে,.বিরক্তবোধ করার জন্য নয়, দূরে পালানোর জন্য নয়। পৃথিবীর সবখানে কর্মকর্তাদের একটি দায়িত্ব হলো, মুবাল্লেগদের আর জীবন উৎসর্গকারীদের (ওয়াকেফীনে জিন্দেগী) মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজেদের অন্তরেও আর অন্যদের মনেও এই শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এঁদেরকে সম্মান করা এবং করানো, নিজেদের সামর্থ্য ও সাধ্য অনুযায়ী এঁদের প্রয়োজনগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা, এঁদেরকে কাজের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা এসব জামাতের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব। যেন এঁরা নিজেদের কাজ সম্পাদনে পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন। এঁরা যেন নিজেদের দায়-দায়িত্ব উত্তমভাবে সম্পাদন করতে পারেন। এঁরা যেন নিজেদের কর্তব্য কোন ধরনের দুশ্চিন্তা ছাড়া সুচারুরূপে পালন করতে পারেন। আপনারা যদি মুরব্বীদেরকে সম্মান প্রদর্শন না করেন তবে আগামী প্রজন্মে মুরব্বী আর ওয়াকেফীন খুঁজে পেতে আপনাদের কষ্ট হবে। আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহ, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রহঃ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে 'ওয়াকফে নও' স্কীমের অধীনে অনেক শিশু সন্তান ওয়াকফ করে জামাতের সেবায় নামতে যাচ্ছেন। কিন্তু আমার নিজস্ব জরিপ অনুযায়ী, আমাদের জামাতে যত সংখ্যায় মুবাল্লেগদের চাহিদা রয়েছে তদানুযায়ী. যথেষ্ট পরিমাণে এক্ষেত্রে ওয়াকেফীন আসছেন না। অনেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছেন। যাই হোক, মুরব্বীদেরকে যখন সম্মান করা হবে, তার বাড়িতে সম্মানের সঙ্গে তার নাম উচ্চারণ করা হবে, তাদের কর্মকান্ডকে প্রশংসার সাথে উৎসাহিত করা হবে তখন তাদের এসব উল্লেখ শুনে বাড়িতে সন্তানরাও জীবন উৎসর্গ করে মুরব্বী হতে চাইবে। এদিক থেকে মুরব্বীদের প্রতি খেয়াল রাখা কর্মকর্তাদের দায়িত্ব। ছোট খাটো মতানৈক্য বা মতামতের ভিন্নতা যেন এমন স্থায়ী সমস্যা হয়ে না দাঁড়ায় যার কারণে উভয় পক্ষে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।

ওয়াকেফীনে জিন্দেগী আর মুরব্বীদেরকেও আমি বলবো, জগত আপনাদের অবস্থান ও মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক, আপনারা আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ স্বীকার করার যে অঙ্গীকার করেছেন আর সততা ও নিষ্ঠার সাথে আপনারা তা পালন করে যাচ্ছেন এক্ষেত্রে জগতের মোটেও তোয়াক্কা করবেন না। নিজের লোকেরা আঘাত দিক বা পরের আঘাত হোক সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কাছে নত হোন। জামাতী ব্যবস্থাপনায় আপনারা তালীম তরবীয়ত ও জগতে ইসলামের বাণী প্রচান করার ক্ষেত্রে যুগ-খলীফার প্রতিনিধি। এটা আপনাদের গুরু দায়িত্ব। যুগ খলীফা এ ধরনের অনেক ক্ষেত্রে আপনাদের প্রতি আস্থা রাখেন এবং এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অতএব, এই গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থেকে জাগতিক সব হিসাব-কিতাব মন থেকে বের করে দিন আর পূর্ণ মনোযোগের সাথে সেই কাজ সম্পাদন করুন যা আপনাদেরকে করতে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় আপনারা যদি এসব আঘাত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেন তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা নিজে আপনাদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও করে দিবেন। মানসিক চাপ দূর করারও ব্যবস্থা তিনিই করে দিবেন। মুরব্বীদের বাসায় জামাতী কর্মকর্তাদের বিষয়ে সন্তানদের উপস্থিতিতে কখনও বিরূপ মন্তব্য করা উচিত নয়। আপনাদের স্ত্রীদেরকেও বুঝিয়ে বলুন, ওয়াকেফে জিন্দেগীর স্ত্রীও ওয়াকেফে জিন্দেগীই হয়ে থাকে কিংবা কমপক্ষে এমনটিই হওয়া উচিত অথবা একই মন-মানসিকতাই তাঁর থাকা উচিত। ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে প্রতিটি সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। আর সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই কান্নাকাটি করতে হবে তাঁর সমীপেই মাথা নত করতে হবে। আল্লাহ্ অবশ্যই আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন (ইনশাআল্লাহ্)।

আমি পুনরায় জামাতী কর্মকর্তাদের সম্বোধন করে বলছি, আপনারা মানুষের জন্য আপনাদের স্নেহ ও ভালবাসার বাহু প্রসারিত করুন। যুগ-খলীফা আপনাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন। আর এই আস্থার বলে তাঁর এই প্রিয় জামাতকে (নির্দিষ্ট অংশ) আপনাদের তদারকিতে তুলে দিয়েছেন। তাই এর প্রতি যত্নবান হোন। প্রত্যেক আহমদী যেন অনুভব করে সে

আপনারা মানুষের জন্য আপনাদের স্নেহ ও ভালবাসার বাহু প্রসারিত করুন। যুগ-খলীফা আপনাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন। আর এই আস্থার বলে তাঁর এই প্রিয় জামাতকে (নির্দিষ্ট অংশ) আপনাদের তদারকিতে তুলে দিয়েছেন। তাই এর প্রতি যত্নবান হোন। প্রত্যেক আহমদী যেন অনুভব করে সে নিরাপদ এক ছায়ায় আশ্রিত। ছোট বড় প্রত্যেকের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করুন।

ওয়াকেফীনে জিন্দেগী আর মুরব্বীদেরকেও আমি বলবো, জগত আপনাদের অবস্থান ও মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক, আপনারা আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ স্বীকার করার যে অঙ্গীকার করেছেন আর সততা ও নিষ্ঠার সাথে আপনারা তা পালন করে যাচ্ছেন এক্ষেত্রে জগতের মোটেও তোয়াক্কা করবেন না।

নিরাপদ এক ছায়ায় আশ্রিত। ছোট বড় প্রত্যেকের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করুন। আমি কয়েকজন কর্মকর্তাদেরকে দেখেছি তারা নিজেদের দফতরে ভয়ানক ভীতিপ্রদ এক ভঙ্গী নিয়ে বসেন বা মানুষের সাথে কথা বলেন। তাদেরকে সবসময় মহানবী (সঃ) এর সেই আদর্শের কথা স্মরণ রাখা উচিত যার উল্লেখ হাদিসের বর্ণনায় সংরক্ষিত। হযরত জারির (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি কখনো মহানবী (সঃ) আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ প্রদানে নিষেধ করেননি আর নবী করীম (সঃ) আমাকে দেখামাত্রই হেসে দিতেন" (এবং প্রফুল্লচিত্তে সাক্ষাৎ করতেন)। দেখুন, কোন ধরনের বিধি নিষেধ ছিল না। আর যখনই দেখা হতো তিনি (সঃ) হাসি-মুখে দেখা করতেন। কোন কোন কর্মকর্তার বিষয়ে নালিশ পাওয়া যায়, লোকেরা তাদের সাথে নিজেদের ব্যস্ততা বাদ দিয়ে দেখা করতে যান আর আমীররা নাকি কখনও কখনও মাসের পর মাস দেখা দেন না। এই নালিশে হয়ত কথা বাড়িয়ে বলা হয়েছে। কেননা নালিশকারীরা কখনও কখনও কথা বাড়িয়ে নালিশ করে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো। একজনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কয়েকদিনইবা ঘুরতে হবে কেন? তাই আমীরদের দায়িত্ব, নিজেদের জন্য সময় নির্ধারণ করুন–অমুক সময়ে আপনাদেরকে কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। এই নির্ধারিত সময়ে লোকদের সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করুন। কোন কোন আমীর তাদের প্রতিনিধি বসিয়ে দেন অথচ প্রতিনিধিরা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার রাখেন না। সেই সিদ্ধান্তের জন্য আমীরের কাছে গেলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তাই আমীরদের নিজে উপস্থিত থাকা উচিত কিংবা প্রতিনিধিদেরকে সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার দেয়া উচিত। সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত প্রতিনিধিকে দিতে হবে। তাহলে আমীরের আর প্রয়োজন কী থাকলো? প্রতিনিধিকেই তাহলে আমীর বানিয়ে দেয়া উচিত।

হাসিমুখে প্রফুল্লচিত্তে মানুষের সাথে সাক্ষাত করুন। আল্লাহ্‌তাআলার কৃপায় আমাদের জামাতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মান অনেক উন্নত। একজন আহমদী তার কাজ হোক বা না হোক, আমীরের মুখের হাসি দেখেই সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। হযরত আবূ যার গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সঃ) আমাকে বলেছেন, "ছোটখাটো পুণ্য কর্মকেও তুচ্ছ মনে করবে না তা তোমার ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল চিত্তে সাক্ষাত করার মত পুণ্য হলেও।" অতএব, হাসিমুখে সাক্ষাত প্রদান আর এক ভাইয়ের আবেগ অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখাটাও একটা নেকীর কাজ। যত বেশি পুণ্য অর্জন করা যায় ততই ভাল। তাই কর্মকর্তা আর আমীরদের এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া উচিত।

এখন আমি জামাতের সদস্যদেরকে জামাতী ব্যবস্থাপনায় তাঁদের দায়-দায়িত্ব ও আচরণ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। প্রথম কথা মনে রাখতে হবে, জামাতের সদস্যদের সমন্বিত আত্মিক ও চারিত্রিক মান যত উন্নত হবে জামাতের কর্মকর্তাদের গুণগতমানও তত উন্নত হবে। তাই প্রত্যেকের উচিত নিজেকে যাচাই করে নিজের অবস্থার উন্নতি সাধনে চেষ্টা করা। একই সাথে জামাতের কর্মকর্তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদানের যে দায়িত্ব রয়েছে তা প্রত্যেক সদস্যের যথাযথভাবে পালন করা উচিত। আপনারা এই উন্নত আচরণ প্রদর্শন করতে পারলে প্রকৃতপক্ষে আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করার কাজ করবেন। এই আদর্শগুলোকে প্রত্যক্ষ করেই আগামী প্রজন্ম আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। এসব মূল্যবোধ ও আদর্শে শিক্ষিত হয়ে যখন এরা বড় হবে তখন যারা কর্মকর্তা নিযুক্ত হবেন তারাও এই উচ্চমার্গের আদর্শ ও চরিত্র দেখাতে সক্ষম হবেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, মহানবী (সঃ) বলেছেন, **"যে আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহ্‌তাআলার আনুগত্য করে, যে আমার অবাধ্য হয় সে আল্লাহ্‌তাআলার অবাধ্য হয়, যে সমসাময়িক শাসকের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে। যে সমসাময়িক শাসকের অবাধ্যতা করে সে আমার অবাধ্যতা করে।"** আমীরের এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য সম্বন্ধে এই আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেউ কেউ বলে, আমরা যুগ খলীফার আনুগত্য করি ঠিকই, তার প্রতিটি আদেশ মানতে আমরা প্রস্তুত; কিন্তু অমুক কর্মকর্তা আমীরের মাঝে অমুক-অমুক ত্রুটি থাকায় তার আনুগত্য করতে আমরা অপারগ। মনে রাখতে হবে, যুগ-খলীফার আনুগত্য তখনই সাব্যস্ত হবে যখন আমীর এবং সমস্ত

মনে রাখতে হবে, যুগ-খলীফার আনুগত্য তখনই সাব্যস্ত হবে যখন আমীর এবং সমস্ত কর্মকর্তার আনুগত্য করা হবে। আর কেবল তখনই আল্লাহ্‌র ও আল্লাহ্‌র রসূলের আনুগত্য সাব্যস্ত হবে।

কর্মকর্তার আনুগত্য করা হবে। আর কেবল তখনই আল্লাহ্‌র ও আল্লাহ্‌র রসূলের আনুগত্য সাব্যস্ত হবে। আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সঃ) বলেছেন, অভাবে বা স্বাচ্ছন্দ্যে, আনন্দে ও কষ্টে, অধিকার থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বা তাদেরকে বেশি প্রাধান্য দেয়ার ঘটনা সর্ব অবস্থায় সমসাময়িক নেতার কথা মান্য করা ও তার আনুগত্য করা তোমার জন্য ওয়াজেব বা আবশ্যক।" এখানে **মহানবী (সঃ) বলেছেন, পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক, তোমাদের অধিকারও যদি খর্ব করা হয়, তোমাদের প্রতি অবিচারও যদি করা হয়, তোমাদের প্রতি সদ্ব্যবহারও যদি না করা হয় অন্যদেরকে যদি প্রাধান্য দেয়া হয় তবুও তোমরা আদেশ মান্য করবে।** প্রকাশ্যে ঝগড়া-বিবাদ-বিতন্ডা আরম্ভ করবে না। আদেশ মান্য করতে অস্বীকৃতি জানাবে না। বরং আনুগত্য করতে থাকা তোমাদের কাজ। জামাতী ব্যবস্থাপনায় তোমাদের অধিকার আছে, কোন অনাচার বা অনিয়ম দেখতে পেলে যুগ-খলীফাকে জানিয়ে দিন। জানিয়ে দেয়ার পর আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন। তখন আবার বিষয়টির পেছনে লেগে থাকার, কি হলো আর না হলো খোঁজ খবর করার প্রয়োজন নেই। যাকে জানানোর তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাজ শেষ হয়েছে। হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "মহ-নবী (সঃ) বয়আত করার সময়ে আমাদের অঙ্গীকার দিয়েছেন, অভাবে থাকি বা স্বাচ্ছন্দ্যে, আনন্দে বা কষ্টে সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর কথা মান্য করবো আর আনুগত্য ও অনুসরণ করবো, আমাদের চেয়ে অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হলেও। আর আমরা যোগ্য কর্মীদের আর ক্ষমতাসীনদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো না। তবে তাদের মাঝে প্রকাশ্য কুফুরী দেখতে পেলে আর আমাদের কাছে

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশ দাতাদের কোন প্রকাশ্য নিদর্শন এসে গেলে তার কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আদেশ সম্বন্ধে আমরা কোন তাচ্ছিল্য কারীর তাচ্ছিল্য প্রদর্শনকে ভয় করবো না আর আমরা ন্যায়-সঙ্গত কথা বলবো।" এর অর্থ হলো, আনুগত্যেরও আওতায় থেকেই ন্যায় কথা বলতে হবে। তবে কেউ শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশনার প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে তার কথা ভিন্ন। একমাত্র এই ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করবেন না। যেমন ঃ পাকিস্তান সরকার আমাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছে- "তোমরা নামায পড়তে পারবে না"। আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ মান্য করা আমাদের মৌলিক অধিকার। কোন জাগতিক সংবিধান শরীয়তের বিধানের চেয়ে বড় নয়। তাই আহমদীরা নামায পড়ে থাকে। এছাড়া অন্য সব দেশীয় আইন মান্য করা হয়। আরেকটি বিবরণ হাদিসে পাওয়া যায়। হযরত আমাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের জন্য এক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসকে শাসক নিযুক্ত করা হলেও তোমরা শ্রবণ কর আর আনুগত্য কর। (অর্থাৎ কথা শোনা মাত্রই আনুগত্য করার মানসিকতা তৈরী কর)।" কাউকে হীন ও তুচ্ছ মনে হলেও তার আনুগত্য কর যখন তাঁকে নেতা নিযুক্ত করা হয়। আরেক স্থলে মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ "কেউ যদি তার আমীরের মাঝে কোন দোষণীয় বা আপাতদৃষ্টিতে মন্দ বিষয় প্রত্যক্ষ করে তাহলে তার উচিত ধৈর্য ধারণ করা। কেননা যে ব্যক্তি জামাত থেকে সামান্য পরিমাণও বিচ্যুত হয় সে অজ্ঞতার মৃত্যু বরণ করে।" এক্ষেত্রে ধৈর্য্যের অর্থ হলো, একজনের দোষ দেখতে পেয়ে গোটা ব্যবস্থার বিপক্ষে চলে যাওয়া ঠিক নয়। ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থেকে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দাও, এরপর ধৈর্য্য ধারণ কর। জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। তোমার সাথে জামাতের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটলে এটাই হবে অজ্ঞতার মৃত্যু। যাদের বক্তব্য হলো, আমরা সহ্য করতে পারছিলাম না তাই আমরা সরে পড়েছিলাম। নামাযে এবং জুমুআর নামাযেও আসা কেউ কেউ বন্ধ করে দিয়েছেন। মহানবী (সঃ) এসব পদক্ষেপকে অজ্ঞতার পদক্ষেপ আখ্যা দিয়েছেন। এধরনের দুর্ঘটনা কালে-ভদ্রে একটা দুটো ঘটে। আল্লাহ্‌তালার অনুগ্রহে সাধারণত সচরাচর এমন ঘটনা ঘটে না। অজ্ঞতাসুলভ আচরণ করা থেকে নিজেদেরকে সবসময় রক্ষা করতে হবে। তোমাদের কাজ হলো, ধৈর্য্য ধারণ কর এবং দোয়া করতে থাকো। আমি প্রথমেই দোয়ার বিষয়টি বলে এসেছি, আল্লাহ্‌তাআলা বলে রেখেছেন ঃ তোমাদের আন্তরিকতাপূর্ণ দোয়া আমি তখন কবুল করবো (ইনশাআল্লাহ্‌)। আরেকটি বিবরণ হাদিসে রয়েছে। হযরত আওফ বিন মালেক (রাঃ) বলেছেন, আমি মহানবী (সঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি ঃ "তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হলেন তাঁরা যাদেরকে তোমরা ভালবাসো আর তারা তোমাদেরকে ভালবাসেন। তোমরা তাঁদের জন্য দোয়া করে থাকো আর তাঁরাও তোমাদের জন্য দোয়া করে থাকেন। তোমাদের সর্বনিকৃষ্ট নেতা হলেন তারা যাদের প্রতি তোমরা বিদ্বেষ পোষণ কর আর তারা তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দিয়ে থাকো, তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দিয়ে থাকেন।" বর্ণনাকারী বলছেন আমরা মহানবী (সঃ)-এর কাছে নিবেদন করলাম ঃ আমরা এধরনের নিকৃষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে দিনই না কেন? তিনি (সঃ) বললেন ঃ "না! তারা তোমাদের মাঝে যতদিন নামায প্রতিষ্ঠা করেন ততদিন এ ধরনের কোন কাজ তোমরা করবে না।" অর্থাৎ, যতদিন এমন নিকৃষ্ট শাসক ধর্মীয় আচার আচরণে বাধা না দেন ততদিন পর্যন্ত অশান্তির পথ পরিহার করে চলবে। দেখুন, এমন অত্যাচারী শাসক যারা তোমাদেরকে এত বিরক্ত করেছেন, যার ফলে তোমরা পরস্পরকে অভিশাপ দিতে আরম্ভ করেছো এসত্ত্বেও তোমাদেরকে বিদ্রোহ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আমাদের জামাত যেন কখনও এ ধরনের পরিস্থিতিতে না পড়ে। এটা একটা চরম দুরাবস্থার উদাহরণ। এ ধরনের দুরাবস্থা হয়ে গেলেও তোমাদেরকে আনুগত্য দেখাতে হবে। দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ্‌তাআলা নিজের বিশেষ অনুগ্রহে যেন জামাতকে তাঁর নিরাপত্তার ছায়াতলে রাখেন (আমীন)।

জামাতের সাধারণ সদস্যরা আর কর্মকর্তারা আল্লাহ্‌তাআলা সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, জামাতের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য একে অপরের অধিকার নিশ্চিত করতে থাকলে আল্লাহ্‌তাআলার এদের সবার প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণ করে যাবেন। মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্‌তাআলা কিয়ামত দিবসে বলবেন, কোথায় তারা যারা আমার প্রতাপ ও মর্যাদার কারণে পরস্পরকে ভালবাসতে? আজকের দিন আমি তাদেরকে নিজের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিব, যে দিন আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নেই।" অতএব, আজ প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় লাভের জন্য সে যেন জগতে আল্লাহ্‌তাআলার মর্যাদা ও প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করে আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পরস্পরের সাথে ভালবাসা, সহমর্মিতা, স্নেহ ও আনুগত্যের উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে এ কাজের সৌভাগ্য দান করুন (আমীন)।

জামাত যখন উন্নতি করে হিংসুকদের হিংসাও বৃদ্ধি পায়। তারাও বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জামাতে অস্থিরতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকেন। সহানুভূতি দেখানোর নামে তারা কথা বলার সুযোগ নেন। অথচ এরা বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে কাজ করে থাকেন। কখনও কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কথা ছড়িয়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধে কুধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন, কখনও জামাতের কোন সদস্যকে উস্কানী দিয়ে দেন, কখনওবা কেন্দ্রীয় কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কুধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা করেন। আবার এরা কখনো কখনো আমাকেও চিঠি লিখে থাকে। সাধারণত এদের চিঠিপত্র বেনামী অর্থাৎ নাম ঠিকানা ছাড়া হয়ে থাকে। তারা লিখে দেন নাউযুবিল্লাহ্‌ জামাতের মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। নাউযুবিল্লাহ্‌ কর্মকর্তারাও আর জামাতের বেশিরভাগ সদস্যরাও হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) প্রদত্ত শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। এসব কথা প্রকৃতপক্ষে তাদের মনের গুপ্ত বাসনা মাত্র। একজন আমাকে তার চিঠিতে এমন ভয়ঙ্কর এক চিত্র এঁকে পাঠিয়েছেন যার মর্ম হচ্ছে জামাত এখন নামেমাত্র বিদ্যমান, এর মাঝে আমলের লেশমাত্র নেই। নিষ্ঠা নেই– গুণগত মানও নেই। তিনি নিজেই আবার তার চিঠিতে

এসবের উত্তরও লিখে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, আমি জানি আপনি আমাকে কী উত্তর দিবেন। আপনি হযরত আলী (রাঃ)-এর মত উত্তর দিয়ে বলবেন ঃ পূর্ববর্তী খলীফাদের অনুসারী ছিলাম আমরা আর আমার অনুসারী হলে তোমরা এবং তোমাদের মত লোকজন। কিন্তু জেনে রাখুন, আমার উত্তর এটা নয়। আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহে এখন আহমদীয়া খিলাফত স্থায়ীভাবে জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠা করার মত লোকজন এই জামাতে সর্বযুগে জন্ম নিতে থাকবেন, ইনশাল্লাহ্। আমার উত্তর হলো, আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে, বর্তমানে এই জামাতে লাখ লাখ, কোটি কোটি এমন সদস্য বিদ্যমান যাঁরা হযরত আলী (রাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে জানেন। জামাতের ব্যবস্থাপনার জন্য, খিলাফত ব্যবস্থার স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করতে জানেন। আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, দুনিয়াদার কোনো মানুষকে এই ভয় দেখালে দেখাতে পারো। আমি প্রতিদিন আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ এবং ঐশী সাহায্য, সদস্যদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার উদাহরণ প্রত্যক্ষ করে থাকি। এসব কথা আমাকে ভীত করতে পারবে না। আর মহান আল্লাহ্ হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সাথে যেসব অঙ্গীকার করেছেন তিনি এ যুগে সেগুলোকে পূর্ণ হতে দেখাচ্ছেন আর আগামীতেও দেখাতে থাকবেন। আপনারা দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের পরবর্তী বংশধরদেরকেও এসব দেখাতে থাকেন. আমীন।

আমি জামাতকে বলবো, দোয়ারত থেকে, জামাতের প্রতিটি স্তরে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার উদাহরণ সৃষ্টি করে যান। বিনয়ের সাথে আপনারা সেই ইসলামের শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন করে যান যা হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে শিখিয়েছেন। বিনয় ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে আপনারা এগিয়ে যেতে থাকলে আপনাদের কোন ভয় নেই। মহানবী (সঃ)-এর আদেশ অনুযায়ী ঐশী জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন; আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। তাদের জন্য আশঙ্কার কারণ আছে যারা পদস্খলিত হয়ে শয়তানের পাল্লায় পড়ে জামাতকে পরিত্যাগ করেন। আল্লাহ্তালার অপার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এবং যারা এই জামাতকে আঁকড়ে ধরে আছেন তাদের কোন ভয় নেই। এদের ইহকাল ও পরকাল স্বাচ্ছন্দ্যময় আছে এবংইনশাআল্লাহ্তাআলা স্বাচ্ছন্দ্যময় থাকবে।

আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে, বর্তমানে এই জামাতে লাখ লাখ, কোটি কোটি এমন সদস্য বিদ্যমান যাঁরা হযরত আলী (রাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে জানেন। জামাতের ব্যবস্থাপনার জন্য, খিলাফত ব্যবস্থার স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করতে জানেন। আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, দুনিয়াদার কোনো মানুষকে এই ভয় দেখালে দেখাতে পারো। আমি প্রতিদিন আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ এবং ঐশী সাহায্য, সদস্যদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার উদাহরণ প্রত্যক্ষ করে থাকি। এসব কথা আমাকে ভীত করতে পারবে না। আর মহান আল্লাহ্ হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সাথে যেসব অঙ্গীকার করেছেন তিনি এ যুগে সেগুলোকে পূর্ণ হতে দেখাচ্ছেন আর আগামীতেও দেখাতে থাকবেন। আপনারা দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের পরবর্তী বংশধরদেরকেও এসব দেখাতে থাকেন. আমীন।

এখন আমি হযরত আকদাস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর লেখার একটি অংশ তুলে ধরছি। তিনি তাঁর প্রিয় জামাতের কাছে কি প্রত্যাশা করেছেন তা ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা সবাইকে তদানুযায়ী চলার সৌভাগ্য দিন, আমীন। তিনি বলেছেন ঃ "আমার জামাতের প্রত্যেক সদস্যের জন্য আবশ্যক, তোমাদের সভায় বা বৈঠকে যেন কখনও অপবিত্রতা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ চর্চা যেন না হয়। তোমরা পবিত্র অন্তর, নির্মল স্বভাব আর সুন্দর চিন্তা চেতনা নিয়ে জগতে বিচরণ করবে। মনে রাখবে, প্রত্যেক অনিষ্ট প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য নয়। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষমা ও মার্জনার অভ্যাস কর, ধৈর্য্য ও সাহসিকতা প্রদর্শন কর আর কারও বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করো না। নিজের কুপ্রবৃত্তির আস্ফলনকে দমন কর। কেউ অজ্ঞতাসুলভ আচরণ করলে এ ধরনের সভা বৈঠক থেকে সালাম করে তাৎক্ষণিকভাবে বেরিয়ে আসবে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) আরও বলেছেন ঃ "খোদাতাআলা তোমাদেরকে এমন একটি জামাতে পরিণত করতে চান যেন তোমরা সমস্ত বিশ্বের জন্য পূর্ণ সততার আদর্শ হও। অতএব নিজেদের মাঝ থেকে এমন ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি বের করে দাও যে অনিষ্ট, দুষ্টামী বিশৃঙ্খলা ও অপবিত্র অন্তরের পরিচায়ক। আমাদের জামাতে যে ব্যক্তি দীনতা, পুণ্য, খোদাভীতি, সহিষ্ণুতা, নম্রভাষী পবিত্রচিত্ত এবং সৎ আচরণ নিয়ে জীবন যাপন করতে পারে না, সে যেন সত্তর আমাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায়। কেননা, আমাদের খোদা এমন ব্যক্তিকে আমাদের মাঝে থাকতে দিতে চান না। সে নিশ্চিতভাবে দুর্ভাগ্য নিয়েই মরবে কেননা, সে পুণ্যের পথ অবলম্বন করেনি।অতএব, তোমরা সাবধান হয়ে যাও এবং সত্যিকার অর্থে দীনতাসম্পন্ন বিনয়ী আর সৎ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যাও। তোমাদেরকে তোমাদের পাঁচ ওয়াক্তের নামায ও উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে সনাক্ত করা হবে। আর যার মধ্যে অনিষ্টের বীজ বিদ্যমান সে এই উপদেশ পালন করতে পারবে না।" যারা আমাকে নানা ধরনের উপদেশ দিয়ে থাকেন তাদের জন্য দুশ্চিন্তার অনেক কারণ রয়েছে। তারা এ জামাতে থাকতে পারবেন না অধচ এই জামাত অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সবাইকে এই শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার সুযোগ দান করুন আর সবসময় জামাতের নিয়মকে আঁকড়ে ধরে, আনুগত্য প্রদর্শন করে, অন্যদের অধিকার নিশ্চিত করে আমরা যেন সেই সব অনুগ্রহ লাভ করতে পারি আল্লাহ্তাআলা যার প্রতিশ্রুতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে দান করেছেন। আল্লাহ্ সবাইকে এর সৌভাগ্য দিন আমীন।

অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী
মুরব্বী সিলসিলাহ

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)

পর্ব ৪ ঃ অধ্যায় ঃ ৩

অদৃশ্যে বিশ্বাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রসঙ্গত বিনয়ের এই মনোভাব মানুষের জানার পরিধি থেকে অজানার পরিধি যে আরো অনেক বিস্তৃত সেই সত্যকেই তুলে ধরে। আর প্রতিনিয়ত নানামাত্রিক জানার ক্ষেত্র এভাবে উদ্ঘাটিত হচ্ছে যে আজকের যুগে আমরা যা জানি, সহস্র বৎসর আগের তুলনায় তা হয়, কোটি কোটি গুণ বেশি (Penshaps a billion times more than what we know a thousand years ago)। আর সমষ্টিগত জানার এই যাত্রা পথে আজ থেকে এক সহস্র বৎসর পরে যা আমাদের নিকট প্রকাশিত হবে, তা হয়ত আজকে যা আমাদের জানা আছে, তার থেকে একইভাবে কোটি কোটি গুণ বেশি হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সেই জানা সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ্তাআলার অনন্ত অসীম অদৃশ্য বিষয়ের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতীয়মান হবে (insignificantly small when compared to the limited unseen treasure house of God's Knowledge)।

এ প্রসঙ্গের জের ধরে এটাও বলা যায় যে, নতুন নতুন জ্ঞানের বিকাশ ও অজানাকে জানার গতি যতটা বৃদ্ধি পাবে (accelerates itspace)। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা ততটাই আরো প্রকট হয়ে উঠবে। এটা আশ্চর্য নয় যে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানার যে পটভূমি আজ আমাদের নিকট প্রকাশ পায়, তার সীমানার বাইরেও অনেক জীবন, শব্দ বা রঙ এর নানা মাত্রিকরূপ বিদ্যমান, যা আমাদের সাধারণ ধারণা বহির্ভূত (Beyond the reach of our normal perception)। আমরা যদি আমাদের দেখা ও শোনার ক্ষমতাকে আরো বাড়াতে পারতাম, তা হলে ওই সব অদেখা ও অজানা অনেক বিষয়ের রূপচিত্র হয়তো নতুন রঙ ও শব্দের মাধ্যমে আমাদের নিকট প্রতিভাত হতো (we would see many new colours and hear many new sounds)।

এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে বিভিন্ন পশুপাখি এমনকি মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন বিষয় এর রঙ, গন্ধ বা স্বাদ প্রসঙ্গে এটা পার্থক্য রয়েছে যে, এর প্রত্যেকটির বাস্তবতাই মূলত একটি আপেক্ষিক বাস্তবতা (Every reality turns into a relative reality)। এটি জীব বিশেষে একেক ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে পরিস্ফুট হয়, এবং এই অভিজ্ঞতার জন্য স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী জীবের উপযোগিতা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, দেখার নানা মাত্রিক রূপের কথা যদি আলোচনায় আনা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, শকুন, মৌমাছি এবং সামুদ্রিক স্কুইডের দেখার ক্ষমতা পরিস্থিতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। এটা সৃষ্টি কর্তার এক অপার মহিমা যে স্কুইড বা বিভিন্ন পোকা-মাকড় যা দেখে মানুষের দেখা থেকে অন্য রকমভাবে, নানা আকৃতিতে, তাদের নিকট দৃশ্যমান হয় (Squids and insects see things in different configuration as compared to humans)। এভাবে ভিন্ন মাত্রিকরূপে দেখা তাদের জীবন ধারণের জন্যই জরুরী। তাই, দৃশ্যমান বস্তুটি বাস্তবে যতটুকু, আর চেয়ে অনেক বড় বা ছোট আকারে তাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয় (Perecive them as either much bigger or much smaller than they actually are)। এভাবেই বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে দেখার এই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মানুষের সহজাত দেখার ক্ষমতাও নানা যন্ত্রপাতির সহায়তায় সে বৃদ্ধি করে নিয়েছে, বিশেষ করে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোস্কোপ ও অন্যান্য সহায়ক কৌশলের মাধ্যমে, যার উল্লেখের খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিউ প্রথম যখন তার আবিষ্কৃত টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশকে দেখেছিল, তখন সে তার এই আবিষ্কারে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিল যে সে সমকালীন অবস্থা থেকে মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে প্রায় ১০০ গুণ বৃদ্ধি করেছে বলে সগর্ব ঘোষণা দিয়েছিল (He proudly announced that he had increased the horizon of human vision by a hundred fold) । তখন হয়ত একথা তার মনে ঘুর্ণাক্ষরেও উদিত হয়নি যে অদূর ভবিষ্যতে এমন টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হবে যা দিয়ে তার আবিষ্কৃত প্রাথমিক টেলিস্কোপের কয়েক লক্ষ গুণ বর্ধিত আকারে মানুষ মহাকাশকে দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা যে, শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্যালিলিউ আর চোখে দেখতে পেত না। তাই অন্যের দেখার দিগন্তকে প্রসারিত করলেও নিজে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় শেষ বয়সে গ্যালিলিউর অনুশোচনার অন্ত ছিল না (This lay heavy on his heart)।

গ্যালিলিউর এই অন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা বিশ্লেষণ করে একটি বস্তুনিষ্ঠ সত্যে আমরা উপনীত হতে পারি। তা হচ্ছে এই যে, অন্ধ হওয়ার আগেই যদি গ্যালিলিউর দৃষ্টিশক্তি না থাকতো, তাহলে দৃশ্যমান গ্যালিলিও হয়ে পার্থিব মহাকাশের যে রূপচিত্র তার নিকট ধরা পড়েছিল, তা কি কখনো সে অবহিত হতে পারতো? আলো আর অন্ধকারে কি পার্থক্য তা

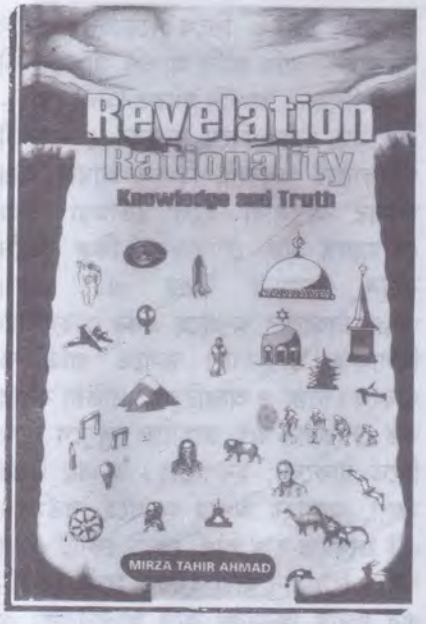

জানাও কি তার পক্ষে সম্ভব হতো? হয়তো অন্যের কাছ থেকে শুনে আলো সম্পর্কে সে একটা অস্পষ্ট ধারণা লাভ করতো। এমনিভাবে একটি অন্ধ সমাজেরও কল্পনা করতে পারি আমরা। এই দৃশ্যমান জগত যেরূপ নানা ব্যঞ্জনায় আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, কিন্তু অন্ধের নিকট তার সম্যক ধারণা লাভ করা কখনো সম্ভবপর না। কিন্তু যদি কোন চক্ষুস্মান লোক তাকে সাহায্য করে। সে ক্ষেত্রে সে নিজে না দেখলেও যেমন অন্যের দেখা আলো বা অন্যান্য জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়, যেগুলো হয়তো ব্যক্তিকভাবে অন্ধের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির বাইরে (Perceive the existence of things which he beyond the reach of their senses)।

অন্ধরা যেমন নিজেরা না দেখলেও আলোর অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে যায় না, তেমনি আপাত বিবেচনায় অদৃশ্য বিষয় ও ঐশী বাণীর অস্তিত্ব সাধারণ মানসে বুঝতে কিছুটা কষ্টকর হলেও সেগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

এখানেই রয়েছে অদৃশ্যে বিশ্বাস বা ঐশী বাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক, যা পার্থিব জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বাস থেকে উত্তম ও অধিক উপযোগিতার প্রকাশ ঘটায় (Supremmacy of revelation over the secular quest)। অন্ধরা যেমন নিজেরা না দেখলেও আলোর অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে যায় না, তেমনি আপাত বিবেচনায় অদৃশ্য বিষয় ও ঐশী বাণীর অস্তিত্ব সাধারণ মানসে বুঝতে কিছুটা কষ্টকর হলেও সেগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। (চলবে)

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন

প্রথম ইউরোপীয় আহমদী মিশনারী
মাওলানা বশির আহমদ আর্চার্ড

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঐশী আলোয়

ইম্ফলের [Imphal] নিকটবর্তী বার্মা সীমান্তের একটি ফাঁড়িতে আমার সেনাদল অবস্থান করছিল। এখানে হাবিলদার ক্লার্ক (সার্জেন্ট) হিসেবে একজন আহমদী কর্মকর্তা ছিলেন। ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি কেন - আমাকেই বেছে নিলেন তা তিনিই ভালো বলতে পারবেন। তাঁর নাম ছিল আব্দুল রহমান দেহলভী। ইউনিটে আমি ছাড়াও ব্রিটিশ বংশোদ্ভুত আরো অনেকে ছিল; কিন্তু যতদূর জানি তিনি কখনোই তাদেরকে তবলীগ করার চেষ্টা করেননি। আমি ছিলাম কমিশন্ড অফিসার আর তিনি হাবিলদার। অধঃস্তন হয়ে আমার মতো একজন উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে ধর্ম প্রচার করা বা তা নিয়ে আলোচনা করা তার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। সঙ্গত কারণেই তিনি কৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর "ইসলামী নীতি দর্শন" বইটির একটি কপি ইংরেজী অনুবাদ কাদিয়ান থেকে আমার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

সেই সময়ে আধ্যাত্মিকভাবে আমি খুবই নিচু পর্যায়ের ছিলাম। ফলে এর বিষয়বস্তুর অধিকাংশই আমার কাছে খুব কঠিন মনে হলো। এবং এর কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। তা সত্ত্বেও বইটির কিছু কিছু অংশ আমাকে উদ্দীপ্ত করলো এবং আমার আত্মিক উন্নতি ঘটালো। পরবর্তীতে আমি সুচিন্তিতভাবে অফিসার্স মেসের পড়ার টেবিলে বইটি রেখে দেই [যেন অন্য অফিসাররাও বইটি পড়ে-অনুবাদক]। তবে কেউ কখনও এটার প্রতি নজর দিয়েছে বলে মনে পড়ে না। গত ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি বইটি পড়ছি এবং এ পর্যন্ত ৩০-৪০ বার বইটি পড়েছি। [১৯৮২ সালের কথা-অনুবাদক]। ক্রিকেটের একজন আশাবাদী ব্যাটসম্যানের মতোই এক্ষেত্রে আমি আমার হাফ সেঞ্চুরী পূর্ণ করার আশা রাখি। এটি হয়তো একটু তাড়াতাড়িই ঘটবে অথবা একটু দেরীতে। আমার দুই সপ্তাহের ছুটি পাওনা ছিল। সেই ছুটিতে আমি কোথায় যাব তা তখনো ঠিক করিনি। হাবিলদার আব্দুর রহমান দেহলবী আমাকে কাদিয়ান যেতে বললো এবং সেখানে তার এক বন্ধুর কাছে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। কাদিয়ান আমার কাছে তখন পুরোপুরিই অচেনা ছিল। আর প্রায় এক হাজার মাইল দীর্ঘ ভ্রমণের কথা ভেবে আমি দমে গেলাম। দু'দিন বাদে তাঁকে জানালাম যে, কাদিয়ান যাচ্ছি না। আমার এ কথা শুনে সে খুব হতাশ হলো। শুধু তার বিষন্ন ও ম্রিয়মান চেহারা দেখে তাকে খুশি করার জন্যই আমি আমার সিদ্ধান্ত পাল্টালাম এবং কয়েকদিনের জন্য কাদিয়ান যাব বলে ওয়াদা করলাম।

ইম্ফলের নিকটবর্তী রেল স্টেশন ছিল সেখান থেকে ৮০ মাইল দূরে মণিপুরের জঙ্গলে। সংযোগ সড়কটি ছিল বন-জঙ্গলে ঢাকা-পাহাড় দিয়ে ঘেরা, আঁকাবাঁকা এবং বাঁক-ধরানো। এটা ছিল কাদিয়ান যাত্রার প্রথম অংশ। অন্তত সপ্তাহ খানেক পর আমি কাদিয়ান পৌঁছলাম। কাদিয়ান ছোট এবং নির্জন একটি শহর। তখন পর্যন্ত সেখানকার কারো সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। তাই অভ্যর্থনা জানানোর জন্য রেল ষ্টেশনে কেউ ছিল না। যা হোক রেল স্টেশনে নেমে আমি একটি টাঙ্গা (ঘোড়ার গাড়ি) ভাড়া করলাম এবং টাঙ্গার চালককে বললাম সে আমাকে যেন মুফতি মুহাম্মদ সাদিকের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানেই আমার থাকার কথা ছিল। ঝাঁকি খেতে খেতে ধীরে-সুস্থে টাঙ্গায় করে অগ্রসর হলাম। কয়েকটি সরু রাস্তা অতিক্রম করে টাঙ্গাওয়ালা একটি বাড়ির সামনে এসে থামলো। বাড়িটির সামনে দেয়ালের সাথের দরজা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ছাদ-সমান উচ্চতায় আরেকটি দরজা পর্যন্ত উঠে গেছে। এই ছাদগুলো সাধারণত উঠোনের ন্যায় ব্যবহার হয়ে থাকে। ঝনঝন শব্দ করে দরজা খুলে গেল। শুভ্র শ্মশ্রুমন্ডিত বর্ষীয়ান এক ব্যক্তি বের হয়ে এলেন। অত্যন্ত গরমের কারণে উর্ধ্বাঙ্গে তিনি কিছুই পড়েননি। তিনি মুফতি মুহাম্মদ সাদিক। পরস্পরকে দেখে আমরা দু'জনেই বিস্মিত হলাম। আমি আমার পরিচয় দিলাম। অতঃপর তিনি টাঙ্গা ওয়ালাকে বললেন আমাকে যেন সে অতিথি ভবনে নিয়ে যায়। সেখানে চুনকাম করা প্রায় আসবাবহীন একটি ঘরে আমি স্থান পেলাম। কিছুক্ষণ পরে মুফতি সাহেব আমার সাথে দেখা করতে এলেন। এবার তিনি একটি ঝুলে- পড়া গাউন ও চমৎকার একটি পাগড়ী পড়ে এসেছেন। পরবর্তীকালে আমি জানতে পারি যে, তিনি প্রতিশ্রুত মসিহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর একজন সাহাবী ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত প্রথম আহমদী মিশনারী ছিলেন।

পরদিন মুফতি সাদিক সাহেব আমাকে কাদিয়ানের বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্থান ঘুরে দেখালেন। মনে পড়ে, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ধূমপান সম্পর্কে জামাত কী মনোভাব পোষণ করে। তিনি বলেন, যদিও এটি সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ নয় তবে এটি নিরুৎসাহিত করা হয়।

আমার এই দুই দিনের ভ্রমণের মাঝে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল আহমদীয়া জামাতের সর্বোচ্চ নেতা, তাদের খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা। এটি ছিল একটি স্মরণীয় ঘটনা যদিও সেই সময় পর্যন্ত আমি তার আধ্যাত্মিক মর্যাদা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি। তিনি (রাঃ) তাঁর ঘরের সামনের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছিলেন। তাঁর (রাঃ) সঙ্গে আমার কি কি কথা হয়েছিল তা আমি হুবহু মনে করতে পারছি না তবে এটুকু মনে আছে যে, আমি বলেছিলাম, একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্য (বয়আতের) দশটি শর্ত পালন করাটাই যথেষ্ট। এর উত্তরে তিনি বলেন যে, এগুলো শুধু মাত্র কিছু মূলনীতি মাত্র যা "Thou shalt not kill" এই আদেশটির মতো ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

তাঁর আলোকজ্জ্বল, সহজ-সরল, প্রসন্ন মুখভার থেকে অস্পর্শনীয় এক নূরের বিকিরণ হচ্ছিল যা এ জগতের ছিল না, বরং অন্য জগতের ছিল। আমি এতে খুবই প্রভাবিত হয়ে পড়ি। তাঁর মধ্য থেকে যেন স্বর্গীয় দ্যুতির প্রকাশ হচ্ছিল। তিনি যখন কথা বলছিলেন; একটি মৃদু কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় হাসি তাঁর মুখে লেগে ছিল। তিনি ছিলেন দৃঢ়-বিশ্বাসের মূর্তরূপ। তাঁর মধ্যে শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক এমন এক আকর্ষণীয় ক্ষমতা ছিল যা তাঁর সামনে উপস্থিত সবাইকে যেন এক অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রেখে ছিল। আমি তখন অনুভব করলাম যে আমি কোনো অসাধারণ ব্যক্তির সান্নিধ্যে আছি।

সেখানে যার সাথেই দেখা হয়েছে আমি খুব মুগ্ধ হয়েছি। অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু এই একটি বিষয়ই আমাকে ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছে। সেই সময়ে ইসলাম সম্পর্কে আমার তেমন একটা জ্ঞান ছিল না। আমি ভাবলাম, যদি

এই লোকগুলি ইসলামের ফলাফল হয় তবে অবশ্যই ইসলামের মধ্যে তুলে ধরার মতো কিছু আছে। সেই সময়ে আমি সঠিক পথ খুঁজছিলাম। পরবর্তীতে অনুভব করেছি যে এই সত্য পথ আমি কাদিয়ানেই পেয়েছি।

কাদিয়ান থেকে ফিরে আসার পথে আমার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সেদিন সন্ধ্যায় আমি অমৃতসর রেল স্টেশনে অপেক্ষা করছিলাম। অমৃতসর কাদিয়ান থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি শহর। তখন অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে মদ পানের জন্য আমিও যোগ দিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে আমার মধ্যে মদের প্রতি ঘৃণার অনুভূতি সঞ্চারিত হলো। কাদিয়ানের সেই পবিত্র পরিবেশের তুলনায় এখানকার পরিবেশ খুব পীড়াদায়ক মনে হলো। আমি সেই মুহূর্তে সারা জীবনের জন্য মদ্যপান ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বার্মা ফ্রন্টে আমার ইউনিটে ফিরে যাওয়ার পর আমি সর্বপ্রথম যে কাজগুলো করেছি তার মধ্যে একটি ছিল, ইতোপূর্বে সংগৃহীত সকল মদের বোতল ছুঁড়ে ফেলা।

আমার সেনাদল এখন আক্রমণাত্মকভাবে বার্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগলো। ফলে জাপানিরা পিছু হটতে লাগলো। এক পর্যায়ে আমরা মেইক্‌টিলা [Meiktilla] নামক একটি ছোট শহরে পৌঁছলাম। সেখানেই আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেই এবং বয়আত ফর্মে স্বাক্ষর করে তা কাদিয়ানে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেই। এটি যে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নেয়ামত

আহমদীয়াত গ্রহণের পর এ পর্যন্ত ৩৫ বছর কেটে গেছে। [এপ্রিল, ১৯৮২ সালের কথা-অনুবাদক]। এই সুদীর্ঘ সময়ে আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে বিভিন্ন দিক দিয়ে অসংখ্য নেয়ামতে বিভূষিত করেছেন।

মদ ও জুয়া

ইতিপূর্বে বলে এসেছি যে, আমি মদ্যপান ও জুয়ার নেশায় আসক্ত ছিলাম। এমনকি আমার ঐতিহাসিক কাদিয়ান সফরের সময়েও আমি এক বোতল হুইস্কি এবং এক বোতল রাম [এক ধরনের মদ] লাগেজে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কোনো উচ্চতর শক্তির প্রভাবে অথবা আমার সুবিবেচনার কারণে আমি সেখানে মদ খাইনি। যদিও সেই সময়ে মদ পান করাকে আমি কোনো দিক দিয়ে খারাপ ভাবতাম না। সাধারণত ঘোড়া গ্রেহাউন্ড কুকুর, ডাইস এবং তাসের খেলায় আমি জুয়া খেলতাম। আমি যখন স্কুলে ছিলাম তখন একবার অন্য অফিসারদের সঙ্গে তাস খেলে আমার এক মাসের বেতন খুইয়েছিলাম। ইসলাম গ্রহণের ফলে মদ ও জুয়া এই দু'টি বদভ্যাস থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান

আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে কিংবা মানব সেবা হিসেবে কিছুই দান করতাম না। ইসলাম আমাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচের মাহাত্ম্য শিখিয়েছে। মানুষ নিজের জন্য যা ভালবাসে তা আল্লাহ্‌র খাতিরে কুরবানি করলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত অশেষ পুরস্কারও পাওয়া যায়। আমার উপার্জনের ১/১৬ ভাগ টাকা আমি চাঁদা দেওয়া শুরু করি। অতঃপর এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে ১/১০ ভাগ টাকা [ওসীয়তকারী হিসাবে হিস্যায়ে আমদ বাবদ-অনুবাদক] চাঁদা দিতে থাকি। অবশেষে ১৯৬৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত উপার্জনের ১/৩ অংশ টাকা চাঁদা দিয়ে আসছি। আমার উপার্জন খুব বেশি নয়। তা সত্ত্বেও সর্বাঙ্গীন সুন্দরভাবেই জীবন যাপন করছি। যাকাত প্রদানের পাশাপাশি আমি নিয়মিত তাহরিকে জাদীদ, আনসারুল্লাহ্ এবং শতবার্ষিকী জুবিলি ফান্ডেও চাঁদা দিয়ে থাকি। এছাড়া ওয়াদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের অনুদানও দিয়ে থাকি।

আমি বলতে পারি যে, শুধুমাত্র টাকা-পয়সাই এ জগতে মানুষকে সুখী করতে পারে না, তৃপ্ত করতে পারে না। মনের শান্তি কারো টাকা-পয়সা বা জাগতিক সহায়-সম্পদের উপর নির্ভর করেনা। শান্তি আল্লাহ্‌র হাতেই রয়েছে। একমাত্র আল্লাহ্‌ই শান্তিতে রাখতে পারেন। ধন্যবাদ আহমদীয়াতকে। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, আমি যে প্রশান্তি লাভ করেছি তা এক সময়ে আমার জন্য অকল্পনীয় ছিল। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে এরূপ প্রশান্তি কখনো লাভ করবো।

সাধারণত ইসলাম গোপনে দান করার শিক্ষাই দেয়। তবে কখনো কখনো প্রকাশ্যেও দান করতে হয়। আহমদীয়াত গ্রহণের ফলে আমি যেসব নেয়ামত লাভ করেছি তার মধ্য থেকে কিছু কিছু আমাকে এ কারণেই বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। জামাতের সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধনে আমি কতটা আবদ্ধ তা এতক্ষণ বর্ণনা করেছি। আমার অর্জিত শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে, শুধুমাত্র টাকা-পয়সাই এ জগতে মানুষকে সুখী করতে পারে না, তৃপ্ত করতে পারে না। মনের শান্তি কারো টাকা-পয়সা বা জাগতিক সহায়-সম্পদের উপর নির্ভর করেনা। শান্তি আল্লাহ্‌র হাতেই রয়েছে। একমাত্র আল্লাহ্‌ই শান্তিতে রাখতে পারেন। ধন্যবাদ আহমদীয়াতকে। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, আমি যে প্রশান্তি লাভ করেছি তা এক সময়ে আমার জন্য অকল্পনীয় ছিল। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে এরূপ প্রশান্তি কখনো লাভ করবো।

প্রার্থনা

আহমদীয়তের মাধ্যমে আমি নামায পড়া শিখেছি যা আমার জন্য অশেষ প্রশান্তির কারণ হয়েছে। এভাবে সূরা রা'দ-এর ২৯তম আয়াতে বর্ণিত **"যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখও, আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে;** [১৩ঃ২১] -তত্ত্বের বাস্তব প্রকাশ লাভ করে পরিতৃপ্ত হয়েছি। নামাযের ক্ষেত্রে আমি এখনো শিক্ষানবিশ। নামায দৈনন্দিন একঘেঁয়ে কাজের চেয়েও বেশি কিছু। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখনী থেকে এবং তাঁর আলোচনা থেকে আমি অনেক কিছু জেনেছি যা আমাকে অনেক অনুপ্রাণিত করেছে।

অনেক সময় আমি বিস্মিত হই যে, একজন মুসলমান যিনি নিজেকে মনে-প্রাণে ইসলামের প্রতি আরোপ করেন, তিনি কীভাবে ইচ্ছাকৃত আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে নামায ছেড়ে দেন! বয়আত নেয়ার পর আমি যখন কাদিয়ানে ছিলাম তখন একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর একটি ঘোষণা শুনলাম। মসজিদে মুবারকের বাইরের দিকে একটি নোটিশ বোর্ডে লেখা ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি গত দশ বছরের মধ্যে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃত এক ওয়াক্তের নামাযও ছেড়ে দেন তবে তিনি নিজেকে সত্যিকারের আহমদী ভাবতে পারেন না।

স্বপ্ন

স্বপ্ন সবাই দেখে। এটি একটি শারীর-বৃত্তীয় ক্রিয়া। এমনকি পশুরাও স্বপ্ন দেখে বলে গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছেন। আদিকাল থেকে আল্লাহ্‌তাআলা স্বপ্নের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ

করে আসছেন। স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জ্ঞান, বাণী এবং ভবিষ্যদ্বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন এমন লোকদের প্রচুর বর্ণনা রয়েছে আল্ কুরআনে এবং পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতে। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বের কোনো স্বপ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমি মনে করতে পারি না। কিন্তু আহমদী হওয়ার পর থেকে আমি এমন অনেক স্বপ্ন দেখেছি যা আমার এখনো মনে আছে। বছরের পর বছর ধরে সেই সব স্বপ্ন আমার এত পরিষ্কার মনে আছে যেন আমি সেগুলো এখনই দেখেছি। সেগুলোর মধ্য থেকে বিশেষ আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ তিনটি স্বপ্ন আমি এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করবো।

১৯৪০ সালে আমি আহমদী হয়েছি। এর কিছুদিন পরে আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি কাদিয়ানে মসজিদে মুবারকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এর সাথে কথা বলছি। তিনি (রাঃ) আমাকে বললেন যে, জীবনে সাফল্য লাভ করতে চাইলে তুমি কখনো দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত হবে না।

এরপর তিনি (রাঃ) তাঁর ডান হাতে ছড়ি তুললেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "এবং এতে কোন সন্দেহ নেই।"

১৯৫৮ সালে স্বল্প সময়ের জন্য আমি কাদিয়ান গিয়েছিলাম। অতিথিশালায় ঘুমানোর সময়ে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম যে, এক ব্যক্তি আমার জন্য এক থালা ঘন মালাই [Cream] নিয়ে এলো। আমাকে বলা হলো যে, এটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু কোন কারণে তা আমাকে দেওয়া হচ্ছে।

১৯৫২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজে আহমদী মিশনারী হিসেবে কাজ করেছি। সেসময়ে আমি একটি স্বপ্নে দেখি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)তাঁর দু'হাতে করে আমাকে এক কাপ পানীয় পান করাচ্ছেন। কাপের প্রতি তাকিয়ে দেখি তাতে দুধ এবং দুধে ভেজা এক টুকরা রুটি রয়েছে।

আমি এই স্বপ্নগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছি কিন্তু কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছিনা।

লক্ষ্য

আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে আমার জীবনের কোনো লক্ষ্য ছিল না। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কোন পারিকল্পনাও ছিল না। যুদ্ধের সময়ে [দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ] বাধ্যতামূলক সৈনিক হিসেবে কাজ করেছি। সে সময় পর্যন্ত আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন হয়ে চলছিলাম। অনেকটা গহীন সমুদ্রে ভাসমান নৌকার মতো। তবে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একবার আমার মাঝে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। সেই রাতে আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম। তখন মনে হলো আমাকে অবশ্যই অসাধারণ হতে হবে এবং অসাধারণ কিছু করতে হবে। আট-দশজন সাধারণ লোকের মতো জীবন-যাপন করতে আমি চাই না। কোন না কোন ভাবে আমি অনুপম হতে চেয়েছি। এটা সেই সময়ের কথা যখন আমার বয়স দশ বছরও পূর্ণ হয়নি। বিষয়টি আমার হুবহু মনে নেই। যা বর্ণনা করলাম তা সেই ভাবনাগুলোর একটি ঝলক মাত্র। এই কামনা আমার অবচেতন মনের গভীরে গেঁথে যায় এবং পরবর্তীকালে তা বাস্তবে পরিণত হয়। আর, তা আহমদীয়াত গ্রহণের মাধ্যমেই ঘটে। পরবর্তী ঘটনাগুলো থেকে আপনারা এর ইঙ্গিত পাবেন।

১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষে আমি ইংল্যান্ডে ফিরে যাই এবং সামরিক চাকুরি থেকে অব্যহতি লাভ করি। আমি সরাসরি ব্রিস্টলে চলে যাই। সেখানে আমার মায়ের কাছে দিন দু'য়েক ছিলাম। তারপর আমি লন্ডন মসজিদের খোঁজে লন্ডন যাই এবং সেই মসজিদের ইমাম মাওলানা জালাল উদ্দিন শামস এর কাছে নিজেকে পেশ করি। তাঁর কাছে লন্ডন মিশনের পক্ষে কাজ করার এবং ইসলামের খাতিরে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করি। মাওলানা জালাল উদ্দিন শামস এই সম্বন্ধে বলেন (বঙ্গানুবাদ ঃ "সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর তিনি যখন ইংল্যান্ডে আসলেন তখন তিনি ব্রিস্টলে তাঁর আত্মীয়দের কাছে দু'দিন ছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি লন্ডন মসজিদে এলেন। আমার সঙ্গে আলাপকালে তিনি লন্ডন মসজিদে থেকে মুসলিম মিশনারী হিসেবে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। একজন মিশনারীর দায়িত্ব এবং আবশ্যকীয় যোগ্যতা সম্বন্ধে আমি তাঁকে অবহিত করলাম। আর তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, তাঁর বিষয়টি সহৃদয়ভাবে বিবেচনা করা হবে এবং পরবর্তীতে তাঁকে পত্র মারফত জানানো হবে। আমার এই তাৎক্ষণিক প্রত্যাখানে তিনি কিছুটা হতোদ্যম হয়ে গিয়েছিলেন, যাহোক এর কিছুদিন পর অন্যান্য ওয়াকেফিনদের মতো তিনি বিনা শর্তে ইসলামের খাতিরে জীবন উৎসর্গ করে– তিনি একজন কার্যকর মিশনারী হতে পারেন-আমার এই মন্তব্য সহ তাঁর দরখাস্তটি আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দেই। আমি তাঁকে আমাদের কাছে অবস্থান করতে বলি এবং ইসলামী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বলি। হযরত আমীরুল মোমেনীন (রাঃ) অনুগ্রহ করে তাঁর ওয়াক্‌ফ অনুমোদন করেন। আর এভাবেই মিষ্টার বশির আহমদ অর্চার্ড অন্যান্য মিশনারীর ন্যায় কাজ শুরু করেন" [রিভিউ অব রিলিজিওন্স, জুন, ১৯৪৭]।

আল্লাহ্‌র কাজ রহস্যে ভরা। এই নগণ্য বান্দাকে ইউরোপের প্রথম আহমদী মিশনারী বানাবেন-এটা তাঁরই পরিকল্পনা। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র বিশেষ আনুকূল্য যা তিনি আমার ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) আমাকে নিম্ন লিখিত নসিহত করেন।

"এখন যে তুমি অপরিচিত, অজানা এবং অচেনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন জাতিসমূহ তোমার জন্য গর্ব অনুভব করবে এবং তোমার প্রশংসার গীত গাইবে। অতএব, স্মরণ রেখো, তোমার কথা ও কাজকে তুমি হালকাভাবে নিও না। এটা ভেবো না যে, তোমার কাজ- কর্ম একান্তই তোমার ব্যক্তিগত বিষয়। না, এগুলো শুধু তোমাকেই নয়, বরং সমগ্র ব্রিটিশ জাতিকেও তুলে ধরে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তোমার আমলকে পদে পদে অনুসরণ এবং অনুকরণ করবে। তোমার আখলাক যদি সুন্দর হয়, মহান হয় এবং ইসলামী হয়, তবে তা তোমার জাতির নৈতিকতাকে সুউচ্চে তোলার ক্ষেত্রে নিয়ামক হবে। কিন্তু যদি তা প্রত্যাশিত মান অর্জনে ব্যর্থ হয়, যদি ইসলামী রঙে রঙিন না হয়, তবে তোমার জাতি বঞ্চিত থেকে যাবে। অতএব, চেষ্টা করো, যেন উত্তর পুরুষদের সামনে উত্তম নমুনা পেশ করতে পার। নতুবা এ কাজের জন্য আল্লাহ্‌তাআলা অন্য কাউকে বেছে নিবেন। যখন সারা দুনিয়াতে আহমদীয়াত বিস্তৃত হবে এবং তা অবশ্যই হবে, দুনিয়ায় কোন শক্তি নেই যে এই নিয়তিকে টলাতে পারে, তখন মানুষের হৃদয়ে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে। এমনকি [তোমার জাতির] সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা তারা তোমাকে করবে।"(রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স, জুন, ৯৪৭)।

মহান আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে আমার জীবনের এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এখানেই শেষ করছি। এই নগণ্য বান্দার প্রতি তিনি যে নেয়ামত বর্ষণ করেছেন তা আকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে ঘোষণা করছি যে, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌র যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। (শেষ)

অনুবাদ - সিকদার তাহের আহমদ

ঐতিহাসিক খেলাফত জুবিলী জলসা

বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐশী নির্দেশে ২৩ মার্চ ১৮৮৯ তারিখ থেকে বয়আত গ্রহণ শুরু করেন। ফলে আল্লাহ্তাআলার রোপিত এ জামাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। দেশ-বিদেশে প্রচার ও প্রসারে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৩৯ সালের ২৩ মার্চ সফলতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সদস্য সংখ্যা পনের লক্ষে পৌঁছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৪ মার্চ ১৯১৪ তারিখে খেলাফতে আসীন হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী জামাতে আহমদীয়ায় সমৃদ্ধি আসে। ১৪ মার্চ ১৯৩৯ তারিখ তাঁর খেলাফতের পঁচিশ বছর পুর্ণতায় ঝলক সৃষ্টি হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে আল্লাহ্তাআলা এক মহান পুত্র সন্তান দান এবং তাঁর অসাধারণ অবদানের সুসংবাদ জানান। ফলে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় ১২ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৯ তারিখ সে পবিত্র পুত্রের জন্ম হয় এবং তিনি তাঁর কীর্তিমান জীবনালক্ষ্যে ঐশী জামাতের খেদমতে বিশেষ অবদান রাখেন। ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ তারিখ তাঁর পঞ্চাশ বছর পূর্ণতা লাভ হয়। তাই ১৯৩৯ সাল ইসলামের পুনরুত্থানে জামাতে আহমদীয়ার সফলতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এর গৌরবময় খেলাফতের পঁচিশ বছরের পূর্ণতা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর প্রতিশ্রুত মহান পুত্র হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর জন্ম ও তাঁর কীর্তিমান জীবন সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণীর অর্ধশতাব্দী অতিক্রমের বছর। ফলে ১৯৩৯ সালটি জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে গৌরবের ও সফলতার বছর। পরম করুণাময় আল্লাহ্তাআলার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন ও তাঁর রহমত প্রাপ্তির আনন্দ উল্লাসের বছর। যাদের জীবনে এ স্বর্ণালী সময় লাভ হয় তাঁরা বড়ই সৌভাগ্যবান। সেজন্য আল্লাহ্তাআলার প্রতি শুকরিয়াস্বরূপ ১৯৩৯ সালে কাদিয়ানে খেলাফত জুবিলী উৎসব পালনের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এ বর্ণাঢ্য উৎসব পালনের মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে তৎকালীন বৃটিশ ভারত সরকারের স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান চৌধুরী ছিলেন অন্যতম সদস্য। তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহীত এ বিরাট কর্মসূচী ১৯৩৮ সালে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতে ঘোষণা করা হয়। সিলসিলাহ্ আলীয়া আহমদীয়ার নেযারত বায়তুল মাল কাদিয়ানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এ তাহরিক ব্যাপক প্রচারিত হয়। অর্থ সংগ্রহে আহমদী জামাতের প্রত্যেক উপার্জনশীল সদস্যদের নিকট থেকে তাঁর এক মাসের উপার্জিত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ এবং উপার্জনশীলদের নিকট থেকে সাধ্যমত অর্থ চাঁদা প্রদানের তাহরিক হয়। জামাতের হিসাবে প্রত্যেক জামাতকে তাঁর বাৎসরিক সাধারণ বাজেটের দেড়গুণ চাঁদা প্রদানের আহ্বান জানানো হয়। জুবিলী ফান্ডের এ চাঁদা ছিল জামাতে আহমদীয়ার প্রথম ঐচ্ছিক প্রদত্ত চাঁদা।

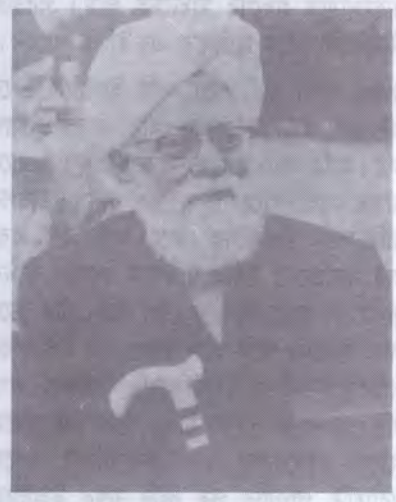

সোনাঝরা দিনের এ তাহরিক শুনে বঙ্গীয় আমীর মৌলভী খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব বঙ্গদেশের বিভিন্ন জামাতে ব্যাপক প্রচার করেন। উপরন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ১৯৩৮ সালের ৪ ও ৫ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরায় বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেন এবং বঙ্গদেশ থেকে জুবিলী ফান্ডে অধিক পরিমাণ চাঁদা প্রদান ও উপস্থিতির সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর ৬, ৭ ও ৮ অক্টোবর ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ২২তম সালানা জলসায় খেলাফত জুবিলীর তাৎপর্য ও পালনের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়। জলসার প্রথম দিন ৬ অক্টোবর দ্বিতীয় অধিবেশনে আলহাজ খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, ৭ অক্টোবর প্রথম অধিবেশনে উকিল মৌলভী বদর উদ্দিন আহমদ, দ্বিতীয় অধিবেশনে মৌলবী এ. কে. এম. খলিলুর রহমান খাদেম এবং ৮ অক্টোবর মহিলা অধিবেশনে পুনরায় মৌলভী মোবারক আলী সাহেব খেলাফত জুবিলীর উপর প্রাঞ্জল ভাষায় সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। (পাক্ষিক আহমদী ৩১ আগষ্ট ১৯৩৮)। ফলে ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালি আহমদীদের মাঝে নেক কাজের প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া জাগে। জলসার অনুষ্ঠানেই ১,৪০০ টাকা চাঁদা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে চাঁদার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়। তখন বঙ্গীয় আমীর সাহেব জুবিলী উৎসবে বাঙালি আহমদীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জুবিলী ফান্ডের উপর একটি ছোট পুস্তকও প্রকাশ করেছিলেন।

এ মহতী প্রোগ্রামে যে সকল বুযূর্গ বাঙালি আহমদীরা চাঁদা প্রদানের ওয়াদা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তা প্রায় পরিশোধ করেন তাদের নাম যেমন আহমদীয়াতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তেমনী স্বর্গের ফিরিশ্তারাও তাদের আমলনামায় পুণ্য সঞ্চয়ে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর্থিক কোরবানির সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের নামের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

নাম ও ঠিকানা	প্রতিশ্রুত টাকা
১। মুন্সী সেরাজউদ্দিন আহমদ সাহেব, ক্রোড়া	২৮/=
২। মুন্সী হাসিমুদ্দিন আহমদ সাহেব, বিরপাইকশা	১২/=
৩। মৌলবী আবুল হোসেন সাহেব, সাবরেজিঃ বাজিতপুর	১৩৯.১৮
৪। মুন্সী আফসর উদ্দিন সাহেব, আহমদীপাড়া	৩.৭৫
৫। মুন্সী এলাহী বক্স সাহেব, ঘাটুরা	৫/=
৬। মুন্সী আফসর উদ্দিন সাহেব, ঘাটুরা	৫/=
৭। মুন্সী আছাব আলী সাহেব, আহমদীপাড়া	১৬/=
৮। মুন্সী সেরাজদ্দিন ভূইয়া সাহেব, বিষ্ণুপুর	৫/=
৯। মুন্সী মিঞা চান্দ সাহেব, আহমদীপাড়া	২৫/=
১০। মুন্সী মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব, আহমদীপাড়া	১০/=
১১। মুন্সী আব্দুল হেকিম সাহেব, আহমদীপাড়া	১২/=
১২। মুন্সী মুসলেহ উদ্দিন সাহেব, আহমদীপাড়া	১০/=
১৩। মুন্সী আব্দুল খালেক সাহেব, আহমদীপাড়া	১০/=
১৪। মুন্সী মজিদ আলী সাহেব, ঘাটুরা	৯/=
১৫। মুন্সী মজির উদ্দিন আহমদ সাহেব, ক্রোড়া	৬/=
১৬। মুন্সী আব্দুল গণি সাহেব, আহমদীপাড়া	২০/=
১৭। খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী, বগুড়া	৫৫০/=
১৮। মৌলবী মীর সিদ্দিক আলী সাহেব, বাজিতপুর	২৩/=
১৯। মৌলবী রহমত আলী সাহেব, বাসারুক	২৫/=
২০। মুন্সী আফসর উদ্দিন সাহেব, ক্রোড়া	৭.৫০

নাম ও ঠিকানা	প্রতিশ্রুত টাকা
২১। মুন্সী আইনল হোসেন সাহেব, ক্রোড়া	৪.১৮
২২। মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব, কৃষ্ণনগর	১২/=
২৩। মৌলবী আজিজুদ্দিন আহমদ সাহেব, ভাদুঘর	১২/=
২৪। মৌলবী আব্দুল আজিজ সাহেব, চরকাওনা	১৬/=
২৫। মৌলবী অসিজ্জামান সাহেব, পাইকশা	১০/=
২৬। মুন্সী আব্দুল হাফিজ সাহেব, তারুয়া	৭.৫০
২৭। মুন্সী আব্দুল বারী সাহেব, সওদাগরপাড়া	১২.৫০
২৮। মুন্সী আফসর উদ্দিন ভুইয়া সাহেব, ক্রোড়া	৫/=
২৯। মুন্সী শামসুদ্দিন সাহেব, ঘাটুরা	৪/=
৩০। মুন্সী আবদুল মালেক সাহেব, আহমদীপাড়া	৬/=
৩১। মুন্সী আলী আহমদ লস্কর সাহেব, ঘাটুরা	৫.৭৫
৩২। মুন্সী একরাম উদ্দিন সাহেব, আহমদীপাড়া	২৫/=
৩৩। হেকীম আব্দুল আজিজ সাহেব, গাঙ্গাবী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	২৫/=
৩৪। মুন্সী আব্দুল গফুর সাহেব, উত্তর চান্দপুর	১২/=
৩৫। মুন্সী মোহাম্মদ ইসহাক লস্কর সাহেব, ঘাটুরা	৩/=
৩৬। মুন্সী সৈয়দ আজিজুল হক সাহেব, তাতারকান্দি	৪/=
৩৭। মুন্সী উজীর আলী সাহেব, বিষ্ণুপুর	২০/=
৩৮। মুন্সী আফজল হুসেন সাহেব, নাটাই	৩/=
৩৯। মুন্সী আব্দুল করীম সাহেব, মোরাইল	৫/=
৪০। মুন্সী আব্দুল কাদের সাহেব, ঘাটুরা	৭.৫০
৪১। মুন্সী আব্দুল আজহার ভুইয়া সাহেব, আখাউড়া	২৮/=
৪২। মৌলবী নেযারত উল্লাহ্ সাহেব, শুহিলপুর	৩/=
৪৩। মৌলবী বদরুদ্দিন আহমদ সাহেব, বি-এল, রংপুর	৪০/=
৪৪। জনাবা শামসুন্নেছা খাতুন সাহেবা, চট্টগ্রাম	১৮/=
৪৫। জনাবা সৈয়দা আজিজুন্নেছা সাহেবা, চট্টগ্রাম	১৮/=
৪৬। মুন্সী আব্দুর রহমান সাহেব, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৫/=
৪৭। মুন্সী আব্দুল আজিজ দপ্তরী, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১০/=
৪৮। মুন্সী সৈয়দ আব্দুল জব্বার সাহেব, মৌরাইল	৮.৫০
৪৯। মুন্সী মীর আব্দুস সাত্তার সাহেব, মৌরাইল	১০/=
৫০। মুন্সী সৈয়দ আব্দুল জলিল সাহেব, মৌরাইল	৫/=
৫১। মুন্সী এ, এস, মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব, মৌরাইল	২০/=
৫২। মুন্সী সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব, মৌরাইল	১২/=
৫৩। মৌলবী মীর মাহবুব আলী সাহেব, বি-এ, সরাইল	৭৫/=
৫৪। মুন্সী আব্দুল করিম সাহেব, আহমদীপাড়া	১৬/=
৫৫। মুন্সী আব্দুল হাই সাহেব, আহমদীপাড়া	১০/=
৫৬। মুন্সী কফিলুদ্দিন সাহেব, মৌরাইল	৮.৫০
৫৭। মুন্সী আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী সাহেব, বগাপুতা	১২/=
৫৮। মৌলবী আব্দুল লতিফ সাহেব, সিউরি	৫০/=
৫৯। মোহাম্মদ আমীর হোসেন সাহেব, নদীয়া	২০/=
৬০। মৌলবী সৈয়দ ইব্রাহীম সাহেব, সাবরেজিষ্টার, চিলমারী, রংপুর	২০২.৮৭
৬১। মোকাররমা সৈয়দা হোসনে আখতার বানু সাহেবা, কাদিয়ান	২০/=
৬২। জনাবা আমেনা খাতুন সাহেবা, কাদিয়ান	১২/=
৬৩। জনাবা তায়েবা খাতুন সাহেবা, কাদিয়ান	১২/=
৬৪। জনাবা আবেদা খাতুন সাহেবা, কাদিয়ান	১২/=

বিঃ দ্রঃ - আনার হিসাব পয়সাকারে দেয়া হয়েছে।

নাম ও ঠিকানা	প্রতিশ্রুত টাকা
৫। মৌলবী আব্দুর রহমান খাঁ বি-এল, ঢাকা	৩০/=
৬৬। হাকীম শাহ আব্দুল বারী সাহেব, ঢাকা	২৫/=
৬৭। মাষ্টার সালাহ্ উদ্দিন চৌধুরী (ছাত্র), ঢাকা	১/=
৬৮। মাষ্টার সালাহ্ উদ্দিন খান (ছাত্র), ঢাকা	২/=
৬৯। মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনওয়ার সাহেব, তাতারকান্দি	২০/=
৭০। মৌলবী সাজেদুর রহমান সাহেব, জলপাইগুড়ী	২৫/=
৭১। মাষ্টার আব্দুল আলী (ছাত্র), ঢাকা	১০/=
৭২। মাষ্টার আব্দুস সামী (ছাত্র), ঢাকা	৫/=
৭৩। মৌলবী আব্দুল কাশেম খান চৌধুরী সাহেব, নাটোর	২৫/=
৭৪। মৌলবী আবুল আছেম খান চৌধুরী সাহেব, নাটোর কলকাতা আঞ্জুমানের সদস্য	১৫/=
৭৫। মিঞা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, [গ্লোব ন্যাশনাল ফ্যাক্টরী]	১০০/=
৭৬। সৈয়দ বদর উদ্দিন সাহেব	৫/=
৭৭। সৈয়দ আব্দুল শুকুর সাহেব	৫/=
৭৮। মিঞা খলীল আহমদ সাহেব	১০০/=
৭৯। মোহাম্মদ আব্দুর রহমান সাহেব	৫০/=
৮০। সৈয়দ হুমায়ুনজাহ সাহেব	৫০/=
৮১। আবু নজর মোহাম্মদ বাহউল হক সাহেব	৫/=
৮২। মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব	৫০/=
৮৩। মিঞা দোস্ত মোহাম্মদ সাহেব	১০০/=
৮৪। মোহাম্মদ বারারা সাহেব	৫/=
৮৫। হাজী মোহকামদীন সাহেব	১০/=
৮৬। আব্দুল আজিজ সাহেব	১২/=
৮৭। মিঞা দোস্ত মোহাম্মদ সাহেব	৫/=
৮৮। মিঞা নজর মোহাম্মদ সাহেব	৫/=
৮৯। মিঞা মোবারক আলী সাহেব	১০০/=
৯০। বশীর আহমদ সিয়ালকুটী সাহেব	২০/=
৯১। খাওরাজা শামসুদ্দীন সাহেব	৩০/=
৯২। মৌলবী দওলত আহমদ খাঁ সাহেব	৬০/=
৯৩। আহমদ সাহেব	৩০/=
৯৪। মৌলবী আসাদ উদ্দীন সাহেব	১৫/=
৯৫। মুন্সী আব্দুল হেকিম সাহেব	১০/=
৯৬। বাবু মোহাম্মদ রফীক এবং বেগম মোহাম্মদ রফীক সাহেব	১০০/=
৯৭। মিঞা মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব	৫০০/=
৯৮। মিঞা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব (কন্টিন্যান্টাল মটর হাউস)	৫০০/=
৯৯। মিঞা মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব (গ্লোব ন্যাশনাল ট্যানারী)	৫০/=
১০০। মিঞা গোলজার আহমদ সাহেব ও বেগম গোলজার আহমদ সাহেবা	২৫/=
১০১। মিঞা মোশ্‌তাক আহমদ সাহেব	২৫/=
১০২। মিঞা মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব	৩০/=
১০৩। মুন্সী সামছুদ্দীন সাহেব	১০/=

নাম ও ঠিকানা	প্রতিশ্রুত টাকা
১০৪। সৈয়দ আব্দুল ওদুদ সাহেব	১০/=
১০৫। মিঞা আতা এলাহি সাহেব	২০/=
১০৬। মুন্সী এসার উদ্দিন আহমদ সাহেব, শ্যামপুর, রংপুর	৬/=
১০৭। মুন্সী গফুর উদ্দিন আহমদ সাহেব, শ্যামপুর, রংপুর	৬/=
১০৮। মুন্সী নেজামুদ্দীন আহমদ সাহেব, শ্যামপুর, রংপুর	৮/=
১০৯। মুন্সী আনোয়ার উদ্দিন আহমদ সাহেব, শ্যামপুর, রংপুর	৩/=
১১০। মুন্সী সালার উদ্দিন আহমদ সাহেব, শ্যামপুর, রংপুর	২.৫০
১১১। মুন্সী বশীর উদ্দিন আহমদ সাহেব, শ্যামপুর, রংপুর	১.৫০
১১২। মুন্সী আমেজুদ্দীন আহমদ সাহেব, শ্যামপুর, রংপুর	১.৫০
১১৩। মুন্সী আব্বাছ আলী মিঞা সাহেব, শ্যামপুর, রংপুর	১.৫০
১১৪। মৌলবী মোহাম্মদ জীনত আলী ভুঞা সাহেব, বি-এ, চিটাগাং	৭৫/=
১১৫। তদীয় স্ত্রী মোসাম্মত সৈয়দা শামসুন নেহার বেগম সাহেবা	৫/=
১১৬। মাষ্টার গোলাম আহমদ খাঁ, চিটাগাং	৫/=
১১৭। মিস্ মোহসেনা বেগম, চিটাগাং	১/=
১১৮। মিষ্টার মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী, ঢাকা	১০/=
১১৯। মিষ্টার আহসানুল্লাহ্ চৌধুরী, ঢাকা	১/=
১২০। মুন্সী আব্দুল জব্বার সাহেব, ঘাটুরা	৫/=
১২১। মিসেস শামসুল হুদা সাহেব, তালশহর	৫/=
১২২। মৌলবী হাফেজ মোহাম্মদ তৈয়বুল্লাহ্ সাহেব, ভরতপুর	২/=
১২৩। বিবি ওয়াসেকা খাতুন্ সাহেবা, ভরতপুর	২/=
১২৪। বিবি মহিদুন্নেসা সাহেবা, ভরতপুর	১/=
১২৫। মৌলবী মোহাম্মদ কাসেদ সাহেব, ভরতপুর	২/=
১২৬। মৌলবী মোহাম্মদ হিক্‌মতউল্লাহ্ সাহেব, ভরতপুর	২/=
১২৭। মৌলবী মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব, ভরতপুর	০.৫০
১২৮। মৌলবী মোহাম্মদ সঈদ সাহেব, আজমপুর	১/=
১২৯। মৌলবী মোহাম্মদ ইউনুস সাহেব, আজমপুর	০.২৫
১৩০। মাওলানা মোজাফফর উদ্দিন সাহেব, ঢাকা	৩৯/=
১৩১। জনাব ডাঃ আবুল হোসেন নদীয়া	১০/=
১৩২। জনাব আব্দুর রহমান, ময়মনসিংহ	৭/=
১৩৩। জনাব আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী	১/=
১৩৪। জনাব ডাঃ মোহাম্মদ মূসা বাঁকুড়া	৫/=
১৩৫। মিসেস মীর রফিক আলী, রাজশাহী	৫/=
১৩৬। গোলাম মৌলা খাদেম, খরমপুর	৬/=
১৩৭। মির্যা আলী আখন্দ, ঢাকা	৪/=
১৩৮। মোহাম্মদ ইয়াসীন, রংপুর	৭৫/=
১৩৯। মিসেস মোহাম্মদ ইয়াসীন, রংপুর	২৫/=
১৪০। জনাব ডাঃ আবুল হোসেন, যশোর	১০/=
১৪১। জনাব সৈয়দা সানী আখতার বানু, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৫/=
১৪২। জনাব আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী	১/=
১৪৩। জনাব ডাঃ মোহাম্মদ ইউসুফ, যশোহর	০.৫০
১৪৪। মাস্টার আজিজ আহমদ, যশোহর	০.২৫
১৪৫। জনাব আব্দুর রাজ্জাক এডবলিন	১/=
১৪৬। জনাব আব্দুর জব্বার বিএবিটি	১/=
১৪৭। জনাব আব্দুল জব্বার, ময়সনসিংহ	৫/=

নাম ও ঠিকানা	প্রতিশ্রুত টাকা
১৪৮। জনাব মীর সেকান্দর আলী, সরাইল	২/=
১৪৯। জনাব রহিমুদ্দিন, তাদুঘর	৬/=
১৫০। জনাব মীর রফিক আলী, রাজশাহী	৭৫/=
১৫১। জনাব ইসহাক মিয়া, রংপুর	০.৫০
১৫২। জনাব গোলাম সামদানী খাদেম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৫/=
১৫৩। জনাব দেলওয়ার হোসেন, রংপুর	৫/=
১৫৪। জনাব গোলাম আহমদ, মুর্শিদাবাদ	৫/=
১৫৫। জনাব আহমদ আলী প্রধান, জলপাইগুড়ি	২৪/=
১৫৬। জনাবা মাহমুদা খাতুন, সরাইল	৩/=
১৫৭। জনাব এ, কে, এম, খলীলুর রহমান খাদেম	১০০/=
১৫৮। জনাব আব্দুস সোবহান গাইবান্ধা	৬৬/=
১৫৯। মিসেস আব্দুল হাদী, নোয়াখালী	২/=
১৬০। হায়দার আলী ভুইয়া, বাসুদেব	১/=
১৬১। মাহমুদা খাতুন, তারাকান্দী	১/=

(পাক্ষিক আহমদী ৩০ নভেম্বর, ১৫ ডিসেম্বর, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ ৩১ জানুয়ারী, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৫ এপ্রিল, ১৫ মে, ৩১ আগষ্ট, ১৫ নভেম্বর ১৯৩৯)।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় আমীর খান বাহাদুর মৌলভী আবুল হাশেম খান চৌধুরী ও খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী সাহেব স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাব অনুযায়ী এক হাজার টাকা করে চাঁদা দানে প্রথম সারির চাঁদা দাতা অর্থাৎ FOUNDERS LIST-এ নাম অন্তর্ভূক্তি করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ফলে দুই বীর বাঙালি চাঁদা দানবীরের এত বড় আর্থিক কুরবানি বাংলার মুখকে উজ্জ্বল করে। ছাড়া বঙ্গদেশের বাইরের আরও যে সকল বুযূর্গ ব্যক্তি এক হাজার বা ততোধিক পরিমাণ চাঁদা প্রদান করে FOUNDERS LIST-এ নাম অন্তর্ভূক্তির সৌভাগ্য লাভ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন -

নাম	চাঁদার পরিমাণ টাকা
১। অনারেবল স্যার চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান	৯,০০০/=
২। তাঁর মাতা ও স্ত্রী	১,০০০/=
৩। জনাব চৌধুরী নাসির আহমদ এলএলবি	১,৫০০/=
৪। জনাব খান বাহাদুর চৌধুরী নেয়ামত খান অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ	১,৫০০/=
৫। জনাব ডাঃ এম এ লতিফ দিল্লী	১০,০০০/=
৬। জনাব মিঞা মোহাম্মদ শরীফ অবসর প্রাপ্ত ইএসি	১,০২৫/=
৭। জনাব শেঠ আব্দুল্লাহ্ আল্লাহ্‌দীন, হায়দারাবাদ	৩,০০০/=
৮। তাঁর স্ত্রী	১,০০০/=
৯। জনাব শেঠ ফাযেল আল্লাহ্‌দীন	১,০০০/=
১০। মোহাম্মদ গাউস হায়দারাবাদ	১,০০০/=
১১। চৌধুরী আজম আলী সাব জজ	১,০০৫/=
১২। রাজা আলী মোহাম্মদ ই এ সি লাহোর	১,০০৫/=

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বংশধরগণও খেলাফত জুবিলী ফান্ডে চাঁদা প্রদানে অগ্রণীয় ভূমিকা রাখেন। সে পুণ্যবান ব্যক্তিরা হলেন-

নাম	চাঁদার পরিমাণ টাকা
১। হযরত উম্মুল মোমেনীন মদ্দেজাল্লাহুল আলী	৫০০/=
২। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ.	১,০০০/=
৩। হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব ল্যাফটেন্যান্ট	৫০০/=
৪। হযরত মির্যা আজিজ আহমদ এক্টা এসিসট্যান্ট কমিশনার	১,০০০/=
৫। হযরত মির্যা রশিদ আহমদ সাহেব এসিসট্যান্ট কমিশনার	৩,০০০/=
৬। সাহেবজাদা মির্যা মোজাফফর আহমদ আই. সি. এস.	৫০০/=
৭। সৈয়দা উম্মে তাহের আহমদ সাহেবা	২০০/=
৮। সাহেবযাদা হাফেয মির্যা নাসের আহমদ সাহেব মৌলভী ফাযেল	১০০/=
৯। সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব মৌলভী ফাযেল বি.এ.	৫০/=
১০। সৈয়দা উম্মে ওয়াসীম আহমদ সাহেবা	৪০/=
১১। সাহেবযাদী মাহমুদা বেগম সাহেবা	২৫/=
১২। সাহেবযাদী তৈয়বা বেগম সাহেবা	৫০/=
১৩। নওয়াব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব ও তাঁর স্ত্রী [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর দুহিতা]	৪,৫০০/=
১৪। বেগম সাহেবা খান বাহাদুর মির্যা সুলতান আহমদ (পাক্ষিক আহমদী ১৫ নভেম্বর ১৯৩৯)।	৫০/=

পবিত্র ভূমি কাদিয়ানে খেলাফত জুবিলী উৎসব পালনের পূর্বে বিভিন্ন স্থানীয় জামাতেও জশনে জৌলুসে তা উদ্‌যাপনের তাহরিক করা হয়েছিল। যেন ঐশী জামাতের প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি খোদাতাআলার প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপনে আনন্দ উল্লাসের অংশীদার হন এবং জামাতে আহমদীয়ার বিশ্ব বিজয়ের প্রবাহমান ধারা প্রত্যক্ষ করে বিরুদ্ধবাদীরা বিস্মিত হয়। তাই বঙ্গীয় আমীর সাহেব বঙ্গদেশের বিভিন্ন জামাতের উদ্যোগে খেলাফত জুবিলী উৎসব পালনের এক ব্যাপক কর্মসূচী প্রদান করেন। বিভিন্ন জামাতে প্রেরিত তাঁর সে কর্মসূচীটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রোগ্রামের নমুনা

১। **হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-কে অভিনন্দন প্রদান**।(এ অভিনন্দন মুদ্রিত করে তাঁর খেদমতে প্রেরণ করা যাবে।)

২। **দরিদ্র ও ভিখারী বিদায়** (জমাতের অবস্থা অনুসারে পয়সা বা চাউল দান করা যেতে পারে)।

৩। **মিছিল**। (সভার দুই এক দিবস পূর্বে হামদ্ দুরূদ এবং ইসলামের প্রশংসা গেয়ে মিছিল শহর বা গ্রাম প্রদক্ষিণ করবেন এবং সভার ইস্তেহার বিতরণ করবেন)।

৪। **তবলিগী পরিভ্রমণ** (সভা ৮/১০ দিবস পূর্ব হতেই সে অঞ্চলের আহমদী যুবকরা বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে দেশবাসীকে নব সঞ্জীবিত ইসলামের সংবাদ পৌছাবেন এবং সভায় ইস্তেহার বিতরণ করবেন)।

৫। **বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের লেকচার**-নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগকে নিজ নিজ ধর্মের পক্ষ হতে মত প্রকাশ করে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করা হবে। বক্তৃতার বিষয় যথা ঃ

(ক) আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

(খ) ধর্ম বৈষম্য সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একতা সাধন করবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

(গ) মানব সমাজে ন্যায্য এবং যথাবিহীত রূপে ধন বন্টনের উৎকৃষ্ট উপায়।

(ঘ)মানব সমাজে পুরুষ ও স্ত্রীকে ন্যায্য এবং যথাবিহীত স্থান প্রদানের প্রকৃষ্ট উপায়।

৬। **বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক একতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তকদের জীবনী ও শিক্ষার আলোচনা**। (এ আলোচনা মাত্র আলোচ্য ধর্মের অনুসরণকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী দ্বারাও সম্পাদিত হতে পারে)।

৭। রচনা প্রতিযোগিতার আহ্বান এবং পারিতোষিক বিতরণ। নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করবার জন্য আহমদী এবং গয়ের আহমদীগণকে আহ্বান করা।

(ক) কুরআন শরীফ হতে সত্য ধর্ম নির্ণয়ের জন্য আবশ্যকীয় প্রমাণ।

(খ) কুরআন শরীফ হতে হযরত রসূলে

করীম (সঃ)-এর দাবীর সত্যতার প্রমাণ।

(গ) কুরআন শরীফ হতে 'মোমেন' ও 'কাফেরের' লক্ষণ সমূহ।

(ঘ) কুরআন শরীফ এবং হাদীস হতে ইসলাম ধর্মের সুরক্ষণের জন্য খলীফার আবশ্যকতার প্রমাণ।

(ঙ) কুরআন শরীফ এবং হাদীস হতে জাতির পুনরুত্থানের প্রকৃত উপায়।

৮। **কুরআর শরীফ তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতা** আহ্বান এবং পারিতোষিক বিতরণ। (এতে আহমদী এবং গয়ের-আহমদী উভযকে যোগদান করতে আহবান করা যাবে)।

৯। **বাংলা এবং উর্দূ কবিতা প্রতিযোগিতা** আহবান এবং পারিতোষিক বিতরণ। এ সকল কবিতায় আল্লাহ্তাআলা, হযরত রসূল করীম (সঃ), হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বা ইসলামের ও কুরআনের গুণগান থাকবে।)

১০। **আহমদী বক্তার লেকচার ঃ**

বিষয় ঃ

(ক) আহমদীয়া মতবাদের অভ্যুদয় ও বিস্তার।

(খ) ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের সাথে আহমদীয়া মতবাদের সম্বন্ধ।

(গ)আহমদীয়া মতবাদই ভারতের তথা জগতের উদ্ধারের একমাত্র পথ।

(ঘ) আহমদীয়া মতবাদে হযরত রসূল করীমের (সঃ) স্থান।

(ঙ) আহমদীয়া মতবাদে হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) স্থান। ইতিমধ্যে কোন কোন আঞ্জুমান কর্তৃপক্ষগণ নিজ নিজ স্থানে এই জুবিলী জলসার অধিবেশনের তারিখ স্থির করেছেন। আশা করা যায় যে, অন্যান্য জেলা আঞ্জুমান কর্তৃপক্ষগণও নিম্নলিখিত তারিখে স্বঃ স্বঃ কেন্দ্রে জলসা করতে সম্মত ও সচেষ্ট হবেন।

জেলা আঞ্জুমান	কেন্দ্র	তারিখ
বাঁকুড়া	বাঁকুড়া	১৪/১৫ মে, ১৯৩৯
মুর্শিদাবাদ	ভরতপুর	১৮/১৯ মে, ১৯৩৯
রংপুর	শ্যামগ্রাম	২১/২২ মে, ১৯৩৯
বগুড়া	বগুড়া	২৫/২৬ মে, ১৯৩৯
ময়মনসিংহ	বাজিতপুর	২৮/২৯ মে, ১৯৩৯
ময়মনসিংহ	আহমদীপাড়া	১/২ জুন, ১৯৩৯
ত্রিপুরা	খড়মপুর	৪/৫ জুন, ১৯৩৯
	তারুয়া	৬/৯ জুন, ১৯৩৯

কলকাতা এবং ঢাকাতে সভার তারিখ পরে স্থির করা হবে। প্রত্যেক জেলা আঞ্জুমান সভার কার্যে নিজ নিজ জেলা আঞ্জুমানে অধীনস্থ মোকামী আঞ্জুমান হতে যোগদান করবেন। ত্রিপুরা জেলার তিনটি কেন্দ্রের জলসায় যথাক্রমে নিম্নলিখিত মোকামী আঞ্জুমানগুলি সংশ্লিষ্ট থাকবে ঃ

আহমদী পাড়া কেন্দ্রে- আহমদীপাড়া, শালগাঁও, কালিসীমা, ভাদুঘর, ঘাটুরা,নাটাই, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মৌরাইল, সরাইল, বাসারুক।

খরমপুর কেন্দ্রে-বিষ্ণুপুর, খড়মপুর-দেবগ্রাম, ক্রোড়া।

তারুয়া কেন্দ্রে-তারুয়া, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

আবুল হাশেম খান চৌধুরী
আমীর বঃ প্রাঃ আঃ আঃ
(পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ ১৯৩৯)

উক্ত কর্মসূচী অনুসারে অনেকগুলি জামাতে জুবিলি উৎসব পালিত হয়। বঙ্গদেশের বাঙালি আহমদীরা উৎসব মুখর পরিবেশে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তা উদযাপন করেন। তন্মধ্যে ৪ ও ৫ জুন ১৯৩৯ তারিখ খড়মপুর কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জুবিলী উৎসবে বঙ্গীয় আমীর মৌলভী আবুল হাশেম খান চৌধুরী, বঙ্গীয় জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী, বগুড়া জেলা স্কুলের হেডমাস্টার মৌলভী মোবারক আলী, বাজিতপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট মৌলভী আবুল হোসেন সাবরেজিষ্টার এবং মুরব্বী সিলসিলাহ্ মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব সকলের মাঝে উপস্থিত হয়ে ঐশী জামাতের অনুষ্ঠানকে সার্থক ও সফল করে তোলেন। খরমপুরের কিল্লা শহীদের মাযারের অদূরে খাদেম পরিবারের মাঝে প্রকৃত আশেকে রসূলদের সমাগমে প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়। জামাতে আহমদীয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তির ঐশী বাণীর ব্যাখ্যা শুনে আমন্ত্রিত অ-আহমদী ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মুগ্ধ হন। (পাক্ষিক আহমদী ১৫ জুন/৩৯) অনুরূপভাবে ২ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখ বগুড়া জামাতের উদ্যোগে স্থানীয় বার লাইব্রেরীতে খেলাফত জুবিলী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। জামাতের বিশিষ্ট বুযূর্গ মৌলভী এ. এম. হোসাম উদ্দিন হায়দার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, গাইবান্ধার মৌলভী আব্দুস সোবহান এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট মৌলভী মোবারক আলী সাহেব সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। তাদের বর্ক্তৃতার বিষয় ছিল আহমদীয়া আন্দোলনের ক্রমোন্নতি, আহমদীয়া আন্দোলনের যথার্থতা এবং আহমদীয়া জামাত কর্তৃক বিশ্ব ধর্ম সমন্বয় সাধন। আহমদী গয়ের আহমদী ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী অধিক সংখ্যক শ্রোতায় বার লাইব্রেরীর হল পরিপূর্ণ ছিল (পাক্ষিক আহমদী ১৫ জানুয়ারী, ১৯৪০)।

অতঃপর কেন্দ্রীয়ভাবে কাদিয়ানের খেলাফত জুবিলী উৎসব ঘনিয়ে আসলে কাদিয়ান প্রেমিক বঙ্গীয় আমীর সাহেব অধিক সংখ্যক বঙ্গবাসীকে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে বঙ্গ দেশের আশি জনের একটি বিরাট কাফেলা প্রাণের টানে দুর্গম গিরি পার হয়ে পবিত্র ভুমি কাদিয়ানে যান। পুণ্য আত্মার সে খোদার পথিকদের মধ্যে ছিলেন ঃ

১। জনাব খান বাহাদুর মৌলভী আবুল হাশেম খান চৌধুরী বঙ্গীয় আমীর তাঁর পরিবার পূর্ব থেকে কাদিয়ানে ছিলেন)

২। জনাব মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ (কাদিয়ানের ছাত্র)

৩। জনাব আবুল হোসেন সাব রেজিষ্টার ও তাঁর পরিবার।

৪। জনাব সিদ্দিকুর রহমান খুরশীদ

৫। জনাব মীর আব্দুস সাত্তার (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

৬। জনাব আসাব আলী চৌধুরী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

৭। জনাব মাষ্টার রজব আলী মুন্সী (বাশারুক)

৮। জনাব এ. এইচ. এম আলী আনোয়ার ও তাঁর পরিবার

৯। জনাব মৌলভী রহমত আলী (বাশারুক)

১০। মৌলভী আহমদ আলী (তারুয়া)

১১। মোহাম্মদ ইয়াকুব (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

১২। আব্দুর রহমান খা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ও তাঁর পরিবার।

১৩। জনাব মাওলানা মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী ও তাঁর পরিবার

১৪। জনাব হামদু মিয়া (বাসুদেব)

১৫। জনাব মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, বাঁকুড়া

১৬। জনাব মাওলানা জিল্লুর রহমান, সদর মুরব্বী ও তাঁর পরিবার

১৭। জনাব শেঠ মুহাম্মদ সিদ্দিক বাণী (কলকাতা)

১৮। জনাব হযরত সৈয়দ আজিজুন্নেসা বেগম (রাঃ)

১৯। জনাব সামসুন্নাহার খাতুন (চট্টগ্রাম)

২০। জনাব মৌলভী আব্দুস সোবহান (গাইবান্ধা) ও তাঁর পরিবার।

২১। জনাব জাফরী সাহেব।

২২। জনাব ডাঃ মোহাম্মদ মুসা (বাঁকুড়া)

২৩। জনাব সুজাত আলী ইন্সপেক্টর (বায়তুল মাল) এবং

২৪। জনাব আব্দুর রব (বাশারুক)

প্রতি বছর কাদিয়ানে সালানা জলসা সাধারণত ২৬, ২৭ ও ২৮ কিংবা ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে জুবিলী উৎসব পালন উপলক্ষ্যে অন্য কোন সময় প্রোগ্রাম না করে জলসাকে খেলাফত জুবিলী জলসা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এবং তিন দিনের পরিবর্তে ২৬ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ পর্যন্ত ৪দিন ব্যাপী উৎসব মুখর পরিবেশে তা উদ্‌যাপনের ব্যাপক ব্যবস্থা নেয়া হয়। **ঐতিহাসিক সে জুবিলী জলসার কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপ ঃ**

২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৯, মঙ্গলবার

প্রথম অধিবেশন ৯-৩০টা হতে ১-৩০

১। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত

২। উদ্বোধনী বক্তৃতা ও দোয়া - হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আইঃ)।

৩। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আইঃ)-ফজিলত' হযরত মৌলানা শের আলী সাহেব বি-এ।

৪। ইসলামী রাষ্ট্র ও খেলাফত- মৌলানা আবদুর রহিম দর্দ এম-এ।

৫। ইসলামে খেলাফত - সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ সাহেব এইচ-এ, বি-এ (অক্সন), প্রিন্সীপাল জামেয়া আহমদীয়া।

৬। খেলাফত ও খ্রীষ্টান পোপ - ডাঃ মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব, ভূতপূর্ব লন্ডন ও আমেরিকান মিশনারী।

যুহর ও আসর নামাজ

দ্বিতীয় অধিবেশন-৩টা হতে ৫টা

১। কুরআন পাঠ।

২। আহমদীয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস-মৌলবী মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব, ভূতপূর্ব লন্ডন মিশনারী।

৩। কবিতা পাঠ।

৪। আহমদীয়া জামাতের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস- হযরত ডাঃ মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব।

৫। খেলাফতের সময়কার ও খেলাফতের পরের ইসলাম - মৌলানা আব্দুর রহীম সাহেব নাইয়ার, ভূতপূর্ব লন্ডন মিশনারী।

২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ বুধবার প্রথম অধিবেশন-৯-৩০ হতে ১-৩০

১। কোরআন তেলাওয়াত

২। দ্বিতীয় খেলাফতের 'বরকত' বা আশীষ-মৌলবী আবুল আতা সাহেব জালান্ধরী, মৌলবী ফাজেল, ভূতপূর্ব পেলেষ্টাইন ও মিসরের মিশনারী।

৩। ইসলামী খেলাফত ও ডিক্টেটরসিপ-স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান, কে, সি, এস, আই।

৪। কবিতা পাঠ।

৫। হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ)-কৃতকার্যতা মৌলানা গোলাম রসূল সাহেব রাজেকী।

জুহর ও আসর নামায

দ্বিতীয় অধিবেশন ২-৩০ হতে

১। কুরআন ও নযম পাঠ।

২। হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (আইঃ) বক্তৃতা।

সন্ধ্যা ৫-৩০ হতে প্রাতে, ৭টা পর্যন্ত মিনারাতুল মসীহতে 'চেরাগ' বা দীপালি করে সমস্ত শহর আলোকিত করা।

২৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ বৃহস্পতিবার

প্রথম অধিবেশন ৯-৩০ হতে ১-৩০

১। প্রত্যেক জমাত নিজ নিজ থাকার স্থান হতে নিজ নিজ পতাকা সহ মিছিল করে গজল গেতে গেতে জলসা স্থানে উপনীত হবেন।

২। কুরআন তেলাওয়াত।

৩। হযরত আমীরুল মোমেনীন কর্তৃক আহমদীয়া পতাকা উত্তোলন।

৪। হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানীকে (আইঃ) 'এড্‌রেস' বা অভিভাষণ প্রদান।

৫। হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (আইঃ) সমীপে স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান কে, সি, এস, আই, কর্তৃক জামাতের পক্ষ হতে জুবিলী উপলক্ষে তোহ্‌ফা বা উপহার পেশ।

৬। হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আইঃ) কর্তৃক এড্‌রেসের উত্তর প্রদান।

জুহর ও আসর নামাজ

দ্বিতীয় অধিবেশন ২-৩০ হতে

১। কুরআন ও কবিতা পাঠ।

২। হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (আইঃ) বক্তৃতা।

২৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার

শেষ অধিবেশন ১০টা হতে ১-৩০

১। কুরআন ও কবিতা পাঠ।

২। খেলাফত ও শিয়া ইমামত-কাজী নাজির আহমদ এইচ-এ, লায়েলপুর।

৩। আহমদীয়া জামাতে খেলাফত-মৌলবী মোহাম্মদ সলীম সাহেব, ভূতপূর্ব পেলেস্টাইন মিশনারী।

৪। কবিতা পাঠ।

৫। ইসলামিক 'কালচার' (শিক্ষা ও সভ্যতা) মৌলবী আব্দুস্ সামাদ উমর সাহেব বি-এ, এল-এল-বি।

৬। খেলাফতের পর মুসলমানদের অবস্থা সৈয়দ জয়নাল আবেদীন অলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব।

৭। হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (আইঃ) শেষ বক্তৃতা ও দোয়া।

(পাক্ষিক আহমদী ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯)।

ঐশী জামাতের উক্ত প্রাণবন্ত কর্মসূচী অনুসারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ২৬ ডিসেম্বর সকাল ৯.৩০ মিনিটে জলসার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ঐ দিন দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করেন আমাদের বঙ্গীয় আমীর সাহেব। হুযূর সানী (রাঃ) কর্তৃক তাঁকে সভাপতিত্ব করার জন্য মনোনীত করায় বঙ্গবাসীরা গৌরবান্বিত হয়। এটা বাঙালিদের জন্য বিরাট প্রাপ্য। এক অধিবেশনের শুরুতে

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন বাংলার কিংবদন্তী মাওলানা আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব। ২৮ডিসেম্বর সকালে প্রত্যেক জামাত বিভিন্ন পুণ্যবাক্য খচিত স্ব-স্ব পতাকাসহ তসবিহ তহমিদ তকবীর ও নযম গেয়ে মিছিল করে জলসাগাহে উপস্থিত হন। এতে বঙ্গদেশের বাঙালিদের মিছিলও ছিল। মিছিলের ঐশী বাণীর ধ্বনিতে কাদিয়ানের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। খোদা প্রেমিকদের মাঝে নূরের পরশের নতুন স্পন্দন জেগে উঠে। মিছিলের পুণ্য বাক্য খচিত ১৫০টি পতাকা জলসাগাহের গ্যালারীতে একে একে খাড়া করে সাজিয়ে রাখা হয়। এতে এক মনোরম দৃশ্যপটের সৃষ্টি হয়েছিল। অতঃপর আমীরুল মোমেনীন আহমদীয়তের পতাকা ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করেন। এবং পতাকাকে সমুন্নত রাখতে তাহরিক করেন। ফলে উপস্থিত সকলে আবেগাপ্লুত হয়ে পতাকাকে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকারবদ্ধ হন। পরে হুযূর (রাঃ) লাজনাদের জলসাগাহে গিয়ে লাজনাদের পতাকা উত্তোলন করেন। জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে এটাই প্রথম পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান।

ঐশী নেতা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রাঃ) প্রতি অভিনন্দন প্রদান কর্মসূচীতে বিভিন্ন জামাতের ১৪টি অভিনন্দন পত্র পেশ করা হয়। টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রাপ্ত অসংখ্য অভিনন্দন পত্রের মধ্যে ১১টি হুযূরের খেদমতে উপস্থাপন করা হয়। বঙ্গদেশের জামাতের পক্ষ থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর সাহেব অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। এটা বঙ্গীয় আমীর সাহেব ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক ২৩তম জলসায় সর্ব সম্মতিতে অনুমোদন করেছিলেন। হুযূর (রাঃ) প্রত্যেকটি অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তর দেন। এবং তিনি চীন দেশীয় অভিনন্দন পত্রটিকে বিশেষ পছন্দ করেন। লাজনাদের পক্ষ থেকে হুযূরের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। তখন জলসার উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে হযরত স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান চৌধুরী (রাঃ) হুযূর (রাঃ) এর খেদমতে দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকার একটি চেক তোহফা হিসেবে পেশ করেন। হুযূর তা গ্রহণ করে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন এ টাকা জামাতের কাজে ব্যয় করা হবে।

উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ জুবিলী জলসা ২৯ ডিসেম্বর সমাপনী অধিবেশনে ঐশী নেতা হুযূর সানী (রাঃ) হযরত রসূল করীম (সঃ) এর একটি অমূল্য হাদিস সকলকে উপহার দেন। প্রকৃত মোমেন হওয়ার জন্য এ হাদিসটি খুবই প্রয়োজনীয়। হুযূর (রাঃ) আদেশানুসারে পাঠকের খেদমতে তা পেশ করা হল ঃ

দেশ বিদেশের পঞ্চাশ হাজারের অধিক লোকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ মহতি জলসা হুযূর (রাঃ) এবং জামাতের বিভিন্ন বুযুর্গ সাহাবী ও আলেমদের বক্তৃতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচীতে প্রাণবন্ত সার্থক ও সফল হয়। আহমদীয়তের বিশ্ব বিজয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। ঐশী নিদর্শন পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। কারণ আজ থেকে পয়ষট্টি বছর পূর্বে তিন লক্ষের অধিক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে অর্ধ লক্ষের অধিক লোকের সমাগমে কাদিয়ানে জলসা করা একটি ঐশী মোজেযাই বটে। কেননা তখনকার তিন লক্ষ টাকা বর্তমানের প্রায় কয়েক কোটি টাকার সমতুল্য। তখন কাদিয়ানের যাতায়াত ব্যবস্থাও ছিল অনেক অনুন্নত ও কষ্টকর। সারা বিশ্বে আহমদীর সংখ্যা ছিল পনের লক্ষ যা বর্তমানের বিশ কোটির তুলনায় খুবই নগণ্য। তাই খেলাফত জুবিলী জলসা আহমদীয়াতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

বিশ্ব মানবের প্রতি রসূল করীম (সাঃ)-এর বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم * نحمده ونصلى على رسوله الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ভ্রাতা,

রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হে-ওয়া -আলিহী-ও সাল্লাম) মহাপ্রস্থানের সময় সন্নিকট হলে 'হুজ্জতুল-বেদায়' সমস্ত মুসলমানদেরকে একত্র সমাহুত করে শেষ উপদেশস্বরূপ এই বাণী প্রচার করেন ঃ

إن دماءكم واموالكم (واعرضكم (এবং আবু বকর রাযি আল্লাহু আনহুর বর্ণনানুসারে

حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا

"এ নগরীতে, এ মাসে, অদ্যকার দিবস আল্লাহ্তাআলা যেরূপ নিরাপদময় করেছেন- (এটা হজ্জের সময়কার কথা) সেরূপই। তোমাদের প্রাণ, তোমাদের ধন (এবং আবু বকর রাজি আল্লাহু আনুহুর বর্ণনানুসারে 'তোমাদের সম্মান') খোদাতাআলা নিরাপদময় করেছেন।" অর্থাৎ, মক্কায় হজ্জের মাস ও হজ্জের সময়কে আল্লাহ্তাআলা সর্বপ্রকারে শান্তিপূর্ণ করবার ন্যায় মোমেনের প্রাণ, ধন ও মান-সম্ভ্রম সংরক্ষণ করা সকলের কর্তব্য। যে ব্যক্তি তাঁর ভ্রাতার ধন, প্রাণ কিংবা মানের হানি ঘটায়-সে সেই ব্যক্তির ন্যায়ই বটে, যে হজ্জের সময় ও পবিত্র স্থান সমূহের অবমাননা করে।

তারপর, তিনি দুইবার বলেন, "যে ব্যক্তি এই হাদীস শ্রবণ করবে, সে পরে তা অন্যান্যদের নিকট পৌছে দিবেন।"

আমি এই আদেশ অনুযায়ী এই হাদীস আপনাদের নিকট পৌছাইতেছি। আপনাদের কর্তব্য, এই আদেশানুসারে, অতঃপর, আপনারা অন্যান্য ভ্রাতৃগণের নিকট উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা মত এই হাদীস পৌছায়ে দিবেন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন যে, যে কেহ এই হাদীস শুনে, তার প্রতি এই আদেশ যে, সে পরে অপরাপর মুসলমান ভ্রাতাগণের নিকট এটা পৌছাইতে থাকবেন।

খাকসার
মির্যা মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী
(কাদিয়ান, পাঞ্জাব)

১৬ই যিলকদ,
১৩৫৮ হিঃ

(পাক্ষিক আহমদী ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৯)।

আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম
(আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম)
হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)

(৮ম কিস্তি)

আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, 'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহীল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর। আল্লাযী খালাকাল মাওতা ওয়াল হায়াতা লি ইয়াবলুয়াকুম আইয়্যুকুম আহসানু আমালান, ওয়া হুয়াল আযীযুল গাফুর। আল্লাযী খালাকা সাবআ সামাওয়াতিন ত্বিবাকান, মা তারা ফী খালকীর রাহমানে মিন তাফাবুতিন্ ফা জিইল বাসারা হাল তারা মিন ফুতুর। সুম্মারজিঈল বাসারা কারত্মাতাইনে ইয়ানতালেব ইলাইকাল বাসারু খাসিয়ান ওয়া হুয়া হাসীরুন। (মুলক রুকূ ১) অর্থ- পরম বরকত ও কল্যাণময় তিনি, যাঁর হাতে সকল আধিপত্য, এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান; যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, তোমাদের মাঝে কর্মের দিক থেকে কে উত্তম, আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল; যিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ। তুমি রহমান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তুমি কি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পাও? অতঃপর তুমি পুনঃপুন দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, (পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবে এমতাবস্থায় যে তা খুবই শ্রান্ত-ক্লান্ত হবে (তবু কোন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না)।

অর্থাৎ সমস্ত জগতে যদি সমষ্টিগতভাবে দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে তোমরা জানতে পারবে, প্রত্যেক প্রয়োজনের এক উত্তর বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক বস্তু যে যে ক্ষমতা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে, তার মাঝে সেই উপকরণই পাওয়া যায় যেন এসকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা যায়। এ দুনিয়ায় সূক্ষ্ম জীবাণুর প্রয়োজন কোটি কোটি মাইল ঘূর্ণায়মান তারার মাধ্যমে পূর্ণ হচ্ছে। সুতরাং প্রয়োজনের এই গন্ডি আর এর পূর্ণ হওয়া দেখ আর জেনে নাও, এ জগতের কেউ না কেউ স্রষ্টা অবশ্যই আছেন যিনি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম প্রয়োজনের প্রতিও দৃষ্টি রেখেছেন এবং প্রত্যেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার উপকরণ বানিয়েছেন।

খোদাতাআলার গুণাবলী সম্বন্ধীয় আরেকটি প্রশ্ন উঠে আর তা হলো- বলা হয় আল্লাহ্‌তাআলা রহমান, তাহলে তিনি বিভিন্ন ধরনের কীট পতঙ্গ কেন সৃষ্টি করলেন? আর দুঃখ কষ্ট ও রোগ ব্যাধিই বা কেন বানালেন?

ইসলাম এ প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছে। ইসলাম খোদাতাআলাকে শুধু রহমান বলেই ক্ষান্ত হয়নি, কুরআন করীমে এসেছে- 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতে ওয়াল আরযা ওয়া জায়ালায যুলুমাতে ওয়ান নূর। সুম্মাল্লাযীনা কাফারু বেরাব্বিহিম ইয়া'দিলুন। (আনআম-২)

অর্থ - সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আকাশ মন্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকাররাশি এবং আলোকের উদ্ভব করেছেন; ইহা সত্ত্বেও যারা অস্বীকার করেছে তারা তাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থিরিকৃত করে। অর্থাৎ প্রত্যেক ধরনের কষ্টদায়ক জিনিসকে অন্ধকারের পুত্র বলা হয়। যেমন সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র জন্তু প্রভৃতি অথবা বিষ বা রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি, এগুলোকেও আল্লাহ্‌তাআলা সৃষ্টি করেছেন। এগুলোকে সৃষ্টি করা কোনভাবে আল্লাহ্‌তাআলার রহমের পরিপন্থী নয় বরং এগুলো তাঁর রহমকেই প্রমাণ করে। এর প্রকৃত তত্ত্বকে সামনে রাখলে খোদাতাআলার উপর কোন ধরনের আপত্তি না উঠে তিনি প্রশংসার যোগ্যপাত্র প্রমাণিত হবেন। এতদসত্ত্বেও যারা এ প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে অনবহিত তারা এগুলোকে সৃষ্টি করা খোদাতাআলার মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করে। কারণ তারা খোদার অন্য এক শরীক বানিয়ে ফেলে এবং বলে, এমন ক্ষতিকারক জিনিসের সৃষ্টিকারী নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে।

দেখ কত সুন্দরভাবে এই সত্যকে প্রকাশ করেছে এবং কেমন সূক্ষ্ম উত্তর দিয়েছে যে, যেসব জিনিসকে ক্ষতিকারক বলে মনে করা হয় তার সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিকর নয়। বরং সৃষ্টির উদ্দেশ্য তো নেক এবং এসব মানুষের উপকারের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই মানুষের উচিত এসবের সৃষ্টির ফলে খোদাতাআলার প্রশংসা করা।

যারা বিষ ও বিষ জাতীয় ঔষধ অথবা আফিন ব্যবহারে মারা যায় এবং যারা এর মাধ্যমে জীবন পায়, এদের মাঝে কাদের সংখ্যা বেশি? নিশ্চিত জেনে রাখ এসব ঔষধ ব্যবহারে অনেক লোক মরতে মরতে বেঁচে যায়। তাহলে কীভাবে বলা যেতে পারে, 'খোদাতাআলা এসব কেন সৃষ্টি করেছেন?' ঠিক তেমনিভাবে সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতির এই একই অবস্থা।

উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী যে সকল জিনিস ক্ষতিকারক বলে মনে হয় যদি এগুলোর উপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে আমাদের সামনে এর এক ভিন্নরূপ প্রকাশিত হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই বিষ মানুষের জীবন নাশ করে কিন্তু দেখুন, রোগীদের জন্য কীভাবে বিষ ও বিষ জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয়, আফিন দেয়া হয়। যারা বিষ ও বিষ জাতীয় ঔষধ অথবা আফিন ব্যবহারে মারা যায় এবং যারা এর মাধ্যমে জীবন পায়, এদের মাঝে কাদের সংখ্যা বেশি? নিশ্চিত জেনে রাখ এসব ঔষধ ব্যবহারে অনেক লোক মরতে মরতে বেঁচে যায়। তাহলে কীভাবে বলা যেতে পারে, 'খোদাতাআলা এসব কেন সৃষ্টি করেছেন?' ঠিক তেমনিভাবে সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতির এই একই অবস্থা। এখনও বিভিন্ন বস্তু-বিশেষজ্ঞরা এদিকে দৃষ্টি দেননি। অন্যথায় যখন তারা এদিকে দৃষ্টিপাত করবে, তখন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে যাবে, এ সকল প্রাণীও প্রাকৃতিগতভাবে খুবই উপকারী। কুরআন করীম হতে জানা যায় এসবের সৃষ্টি মূলত মানব সৃষ্টির পটভূমি ছিল এবং পৃথিবীর উপরে সাপ বিচ্ছুরও এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ সকল প্রাণী মানব সৃষ্টির প্রথম অবস্থা ছিল। আজকাল কতক লোক যে ধারণা করে সেভাবে নয় বরং এ সকল প্রত্যেক প্রাণী পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধনে সহায়ক হয় আর এই পরিবর্তন এ সকল প্রাণীর মুখাপেক্ষী হয়।

এভাবে তিনি বলেন- 'ওয়া মিন আয়াতিহী খালকুস সামাওয়াতে ওয়াল আরযে ওয়া মা

বাস্‌সা ফীহিমা মিন দাব্বাতিন, ওয়া হুয়া আলা জাময়েহিম ইযা ইয়াশাউ ক্বাদীর। ওয়া মা আসাবাকুম মিন মুসীবাতিন ফাবিমা কাতাবাত আইদীকুম ওয়া ইয়াফু আন কাসীর' (সূরা শূরা-৩০, ৩১)।

অর্থ ঃ আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সমস্ত জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন তা তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। এবং তিনি যখন চাইবেন তাদের সকলকে একত্রিত করতে সক্ষম। আর তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ নিপতিত হয় তা তোমাদের কৃতকর্মেরই কারণে। তোমাদের বহু অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা সূর্য-চাঁদ-তারা এবং এগুলোর মাঝে অবহিত সব কিছু সৃষ্টি করে পৃথিবীতে মানুষকে হাকিম বানিয়ে দিয়েছেন। এখন যদি তারা কোন জিনিস হতে উপকৃত না হয় অথবা সেগুলোর অপব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে এটা তাদের নিজেদের দোষ। আল্লাহ্‌তাআলা যা করেন তা হলো- তাদের ভুলের মন্দ পরিণাম থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে নেন। সুতরাং মানুষের দুঃখ কষ্ট আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে আসেনি বরং এই প্রাকৃতিক নিয়মের অপব্যবহার করার কারণে এসেছে, যা মূলত মানুষের উপকারার্থে বানানো হয়েছিল।

রোগব্যাধিও প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরিণাম যা মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে রাখা আছে। মানুষের সব ধরনের উন্নতি তার এ শক্তি সমূহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি তার মাঝে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি না থাকত তাহলে আজ মানুষ যেমন আছে, কখনও হতে পারতো না। এগুলো এক সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক জিনিসের উপর প্রভাব ফেলে। এর দ্বারা নিজে প্রতিক্রিয়াশীল হয় এবং যখনই কেউ এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় নিয়ম ভঙ্গ করে তখনই সে অসুস্থ হয়ে যায় অথবা দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়। সুতরাং রোগ-ব্যাধি আল্লাহ্‌তাআলা সৃষ্টি করেননি বরং খোদা সেই নিয়মকে বানিয়েছেন যা মানুষের উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত। এতে কম বেশি করলে মানুষ নিজেই রোগ সৃষ্টি করে। আর রোগ ব্যাধি- যে সকল নিয়মাবলীর ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় যেহেতু তা স্ব-স্থানে রহমতেরই ফল তাই রোগ-ব্যাধির সৃষ্টিতেও খোদাতাআলার সত্তায় কোন ধরনের আপত্তি উঠতে পারে না। রোগ-ব্যাধির যে অবস্থা পাপেরও হুবহু একই অবস্থা। পাপেরও রোগ ব্যাধির মত কোন স্বাধীন সত্তা নেই। পাপ হলো কেবল প্রাকৃতিক বিধানের বিরুদ্ধে অথবা শরীয়তের বিধানের বিরুদ্ধে আগে বেড়ে যাওয়া যা পিছনে রয়ে যাবার নাম। সুতরাং পাপের উপস্থিতিতেও খোদাতাআলার রাহমানিয়্যাত ও কুদ্দসিয়াতের উপর কোন ধরনের আপত্তি উঠতে পারে না।

সুতরাং মানুষের দুঃখ কষ্ট আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে আসেনি বরং এই প্রাকৃতিক নিয়মের অপব্যবহার করার কারণে এসেছে, যা মূলত মানুষের উপকারার্থে বানানো হয়েছিল।

কুরআন করীমে যত ধরনের গুনাহ্‌র উল্লেখ আছে তার সবই হলো এমন, এগুলো উগ্রতা অথবা শিথিলতার দিকে নির্দেশনা করে। কোন এমন শব্দ নেই যা প্রমাণিত নাম হতে হয়েছে এ থেকে বুঝায় যায়, কুরআন করীমের মতে গুণাহ্‌র কোন স্বাধীন সত্তা নেই বরং নেকী না থাকার নামই হল গুনাহ। আর এই না হওয়াটা বান্দার কর্মের প্রতিফল। যখন সে খোদাতাআলা প্রদত্ত নেয়ামতকে ছেড়ে দেয় অথবা অন্যের অধিকার খর্ব করে তখন সে কোন জিনিসকে ইতিবাচক না করে নেতিবাচক করার জন্য দোষী বলে সাব্যস্ত হয়।

'ক্ষতিকর জিনিসের বিদ্যমান থাকা স্বত্ত্বেও খোদাতাআলার উত্তম গুণাবলীর উপর কোন আপত্তি হতে পারে না' এই যে সূক্ষ্ম শিক্ষাটি কুরআন করীম পেশ করেছে তা অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থ কখনও পেশ করে না, আর না দলিলের সাথে দাবী করে। কুরআন করীম শুধু খোদাতাআলার গুণাবলীকেই বর্ণনা করে না বরং এ ব্যাপারে এমন বিশদ জ্ঞান দান করে যার মাধ্যমে ভালবাসা ও আনুগত্যের আবেগে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যায়, এবং মস্তিষ্ক মাতাল হয়ে যায় এবং চোখও নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় আর সমস্ত সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব একবারে নিঃশেষ হয়ে যায় এটা কুরআন করীমের পূর্ণতার প্রমাণ। যদি এমনটি না হয় তাহলে শুধু সুন্দরভাবে খোদাতাআলার সিফত বর্ণনা করা (সে গ্রন্থের) পূর্ণতার কোন দলিল নয়।

তেমনিভাবে উদাহরণস্বরূপ খোদাতাআলার সিফত 'রহম' এর বিরুদ্ধে এ প্রশ্ন উঠানো হয়- বড়রা তো তাদের কর্মের ফলে দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয় কিন্তু বাচ্চারা কেন কষ্টে নিপতিত হয়? এ প্রশ্নের উত্তরও উপরোক্ত বর্ণনায় চলে এসেছে। অর্থাৎ খোদাতাআলা একটি নিয়ম বানিয়ে দিয়েছেন আর সেই নিয়মের মাঝে এ বিষয়টি রাখা হয়েছে, প্রত্যেক জিনিস অন্য জিনিস দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদি এই নিয়ম না থাকত তাহলে মানুষ পরিবর্তিত হতো না আর যদি মানুষ পরিবর্তত না হয় তাহলে আজ মানুষ যে উন্নতি করছে তা কখনও করতে পারতো না। অনুরূপভাবে এ নিয়ম অনুযায়ী বাচ্চারা মা বাবা হতে ভাল কথাও গ্রহণ করে আর খারাপ কথাও। তাদের কাছ থেকে স্বাস্থ্যও নেয় আর রোগ-ব্যাধিও। যদি রোগ ব্যাধি অথবা দুঃখ কষ্ট মা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে না পেত তাহলে ভাল ক্ষমতাও পেত না। ফলশ্রুতিতে সে মানুষ না হয়ে পাথর হতো যা ভাল খারাপ কোন প্রভাবই গ্রহণ করত না। আর মানব সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য তা ধ্বংস হয়ে যেত। আর মানুষের জীবন পশুর চেয়েও নগণ্য হয়ে যেত। আর একটি প্রশ্ন থেকে যায় আর তা হলো- প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে মানুষ যে কষ্ট ভোগ করছে মানুষ এই কষ্টের কী প্রতিদান পাবে? কেননা, যদিও প্রাকৃতিক বিধান মানুষের উন্নতির জন্য কিন্তু কেউ কেউ এর পরও তাদের ভুলের কারণে দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়ে যায়।

আমাদের শরীয়ত এর উত্তর এভাবে দিয়ে থাকে-কখনও কখনও মানুষ এমন কিছু কারণে কষ্ট পেয়ে থাকে যাতে মানুষের কোন হাত থাকে–না, এমন সব কষ্টের দিকে (হিসাবের সময়) অবশ্যই দৃষ্টি রাখা হবে। আর মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সময় এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, 'আল ওয়াযনু ইয়াওমাইযিনিল হাক্ক্ব। (আরাফ-৯) (অর্থ- আর সেই দিনে ওজন হবে নিশ্চিত সত্য) সেই মহান প্রতিদানের সময় এ বিষয়কে দৃষ্টিতে রাখা হবে যা মানুষের উন্নতির অন্তরায় ছিল এবং যাতে মানুষের কোন হাত ছিল না। (চলবে)

অনুবাদ- মোহাম্মদ সোলায়মান

ফ্ল্যাশ ব্যাক : জলসা সালানা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রত্যেকটি সদস্যের নিকট সালানা জলসার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যেক আহমদী বাৎসরিক এই সম্মেলনে অংগ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে আর দোয়া করতে থাকে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন ঃ "মহান আল্লাহ্তাআলার কিছু উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্র যিক্র হতে থাকে। অতএব যখন তাহারা এমন মজলিসের সন্ধান পান যেখানে আল্লাহ্র যিক্র হতে থাকে, তাঁরা তাঁদের সাথে বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তাঁরা একে অপরকে আবৃত করেন। এমন কি তাঁদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস হতে উঠে যায় তখন ফিরিশ্তাগণও আকাশে চলে যায়। সেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যিনি তাহাদের অপেক্ষা বেশি জানেন, তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হতে এসেছ?" তখন তাঁরা উত্তর দেন, 'আমরা তোমার ঐ সকল বান্দার নিকট হতে এসেছি, যারা প্রকৃতিতে তোমার গুণকীর্তন করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার কাছে চাইছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা আমার নিকট কি চাইছিল?' ফিরিশ্তাগণ বলেন, 'তারা তোমার নিকট জান্নাত চাইছিল।' আল্লাহ্ পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?" ফিরিশ্তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু-প্রতিপালক! না, তারা দেখেনি।' তিনি বলেন, 'কি অবস্থা হত যদি তারা আমার জান্নাত দেখত!' ফিরিশ্তাগণ বলেন, 'তারা তোমার নিকট তোমার আশ্রয়ও প্রার্থনা করছিল।' তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা কি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছিল?' ফিরিশ্তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু-প্রতিপালক! তারা দোযখের আগুন হতে আশ্রয় চাইছিল।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার দোযখের আগুন দেখেছে?' তখন তারা বলেন, 'তারা তোমার দোযখের আগুন দেখেনি।' তিনি বললেন, 'তাদের কি অবস্থা হতো যদি তারা আমার আগুন দেখত।' তখন তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম।' তারা আমার কাছে যা চাইছিল তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা হতে আশ্রয় চাইছিল তাদেরকে আশ্রয় দিলাম।' তখন তারা বললেন, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাদের মধ্যে অমুক তো অত্যন্ত গুনাহগার বান্দা ছিল যে ঐ জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সে-ও তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল, 'তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম, কেননা তারা তো ঐ সকল আশিষ-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সে-ও বঞ্চিত হবে না" (মুসলিম)। এ হাদিস হতে জলসার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়, জলসা সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "এ জলসা এমন তো নয় যে, জাগতিক মেলার মত অযথা এর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিতেই হবে। বরং-এ জলসা অত্যন্ত পবিত্র নিয়্যত ও মূল্যবান ফলাফল বহনকারী হতে হবে। এ জলসা রং-তামাসার জন্য নয়।

জলসা সালানার ইতিহাস ঃ

প্রথম সালানা জলসা ঃ আহমদীয়া জামাতের প্রথম জলসা সালানা যা ডিসেম্বর ১৮৯১ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯১ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'আসমানী ফয়সালা' নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এতে যে সকল আলেম তাঁকে কাফের ফতওয়া দেন, তাদের তিনি দাওয়াত দেন ও বলেন, 'কুরআন

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

মজিদে মুমিনদের যে সব নিদর্শন আছে, তার সাথে আমাকে তুলনা করুন, তুলনার ফলাফলকে নিরপেক্ষরূপ দেয়ার জন্য তিনি লাহোরে একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। আর এই আঞ্জুমানের সদস্যদের নির্বাচন বিরোধীদের মত অনুসারে করার কথাও চিন্তা করেন। এই আঞ্জুমান গঠন সম্পর্কে পরামর্শের জন্য জামাতের সদস্যগণকে ১৮৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর কাদিয়ানে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ জলসাতে ৭৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এ দিন যুহরের নামাযের পর বায়তুল আকসাতে জলসা শুরু হয়। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম শিয়ালকোটি সাহেব 'আসমানী ফয়সালা' পুস্তিকাখানা পাঠ করেন। এই দিনেই প্রবন্ধটি প্রকাশ করা এবং বিরোধীদের মতামত গ্রহণ করে আঞ্জুমানের সদস্য নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপস্থিত সকলে হুযূরের সাথে করমর্দন করেন। এই ছিল জলসার সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী।

"এ জলসা এমন তো নয় যে, জাগতিক মেলার মত অযথা এর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিতেই হবে। বরং এ জলসা অত্যন্ত পবিত্র নিয়্যত ও মূল্যবান ফলাফল বহনকারী হতে হবে। এ জলসা রং-তামাসার জন্য নয়।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সময়ে অন্যান্য জলসা ঃ

আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় জলসা ১৮৯২ সালের ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় খোদার ফযলে ৫০০ জন মেহমান অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে ৩২৭ জন কাদিয়ানের বাইরে থেকে আগত, ১৮৯৩ সালের জলসা সালানা বিভিন্ন কারণে স্থগিত থাকে। ১৮৯৪ সাল হতে ১৯০০ পর্যন্ত কাদিয়ানের বায়তুল আকসাতে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৬ সালে ডিসেম্বর নামে লাহোরে সর্বধর্ম সম্মেলনে 'ইসলামী নীতি দর্শন' প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। তাই এ বছর জলসা সালানা মুলতবী করা হয়।১৯০০ সালেও কাদিয়ানের বায়তুল আকসাতে ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর জলসা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অসুস্থতার জন্য শুধুমাত্র একবার বক্তব্য

রাখেন। এ জলসাতে ১৫০০ জন মেহমান অংশ নেন। ১৯০১ সালের জলসা সালানাতে মেহমানদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। এই জলসা সালানাতে এত মেহমান অংশ নেন যে জুমুআর নামাযে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না।১৯০৬ সালের জলসা সালানার উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বেহেশ্‌তি মকবেরার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আঞ্জুমান গঠন করা হয়। এবং এর নাম রাখা হয় "আঞ্জুমানে আহমদীয়া কারপরদায মাসালেহ বেহেশ্‌তি মাকবেরা।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জীবনের শেষ জলসা অনুষ্ঠিত হয় কাদিয়ানের বায়তুল আকসাতে ২৬-২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৭ সালে ২৬ ডিসেম্বর সকালে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ভ্রমণে বের হন, তখন অনেক মেহমান তাঁর সাথে যান। ভ্রমণের এক পর্যায়ে তিনি একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে প্রায় দু'ঘন্টা খাদেমদের সাথে মোসাফাহা করেন।

২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর তারিখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জামাতের সকলকে নফস পরিশুদ্ধ করার দিকে মনোযোগী হওয়ার জন্য বলেন, ২৮ ডিসেম্বর তিনি (আঃ) বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "জীবনের কোন ভরসা নেই, আজ যারা এখানে উপস্থিত আছেন কেউ জানে না আগামী বছর পর্যন্ত কারা জীবিত থাকবে এবং কারা মারা যাবে।" এ জলসায় মেহমান এত বেশি ছিল যে, জুমুআর দিন বায়তুল আকসার আশ-পাশের দোকান, বাড়ি ও ডাকঘরের ছাদের উপর লোকেরা নামায আদায় করে। জলসা সালানা শুরুর পর হতে হুযূরের জীবদ্দশায় ১৭ বার জলসার সময় আসে। এর মধ্যে ১৮৯৩, ১৮৯৬ এবং ১৯০২ এই তিন বার জলসা মুলতবী হয়ে যায়। ১৪টি জলসায় হুযূর উপস্থিত থেকে জলসাকে বরকতমন্ডিত করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ)-এর সময়ে অনুষ্ঠিত জলসা সালানা ঃ

হযরত হাকীম মৌলভী আলহাজ নূরুদ্দীন সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) এর খেলাফতকালে ৬টি জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ সালের জলসা বিভিন্ন কারণে ১৯১০ সালে ২৫ হতে ২৭ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১০ সালের জলসা সালানা ২৫-২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এ হিসাবে ১৯১০ সালে দু'টি জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত হাকীম মৌলভী আলহাজ নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এর সময়ে অনুষ্ঠিত জলসা সালানা ঃ

১৯১৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) খেলাফতের আসনে সমাসীন হন। তাঁর ৫২ বছর দীর্ঘ খেলাফতকালে ৫২টি জলসা অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে ৩৩টি জলসা কাদিয়ানে হয়। এর মধ্যে ৩২টি জলসা বায়তুন নূর সংলগ্ন মাঠে এবং ১৯৪১ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের বায়তুল আকসাতে সম্পন্ন হয়। পাকিস্তানের পূর্বে ভারতে অবস্থানকালে কাদিয়ানের শেষ জলসা বায়তুন নূর সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর সময়কালে ১৯টি জলসা হয়। এর মধ্যে ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ এর জলসা মার্চ মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

এসব জলসার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঃ

১৯১৪ সালে মহিলারা প্রথম জলসাতে অংশ নেয়। ১৯১৭ সালে মহিলাদের প্রথম জলসা হয় যাতে পৃথকভাবে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২২ সালে লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং প্রথম মহিলাদের জলসা যা হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেবের বাড়িতে হয়। ১৯৩৬ সালে প্রথম জলসা সালানায় লাউড স্পীকার ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৯ সালের জলসা খিলাফতের জুবিলী জলসা হিসেবে পালিত হয়। ২৪শে ডিসেম্বর সকাল হতে খেলাফতের জুবিলী কার্যক্রম শুরু হয়। বিভিন্ন এলাকা ও দেশ হতে জামাতসমূহ আল্লাহ্‌র প্রশংসাগীতি ও আহমদীয়াতের গান গাইতে গাইতে পতাকা হাতে জলসায় পৌঁছায়। প্রায় দেড় শতাধিক পতাকা জলসাগাহের চারদিকে উত্তোলন করা হয়। হযরত চৌধুরী জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার চেক হুযূরের খেদমতে পেশ করেন। হুযূর এ চেক গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, এ টাকা জামাতের কাজে ব্যবহার করা হবে। এরপর হুযূর দোয়া করান এবং নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দেন। এ সময় প্রথমে তিনি জামাতে আহমদীয়ার পতাকা ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর লাজনাদের জলসাগাহ্‌তে গিয়ে লাজনাদের পতাকাও উত্তোলন করেন।

একটি ঐতিহাসিক জলসা ঃ

আহমদীয়াতের ইতিহাসে ১৯৪৪ সালের জলসা সালানা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে হুযূর (রাঃ) কে কাশফের মাধ্যমে জানানো হয় যে, তিনিই মুসলেহ্ মাওউদ। এ জলসায় তিনি যে বক্তব্য রাখেন তাতে হলফ করে স্বীকার করেন যে, তিনি মুসলেহ মাওউদ; মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্‌তাআলা সেই প্রতিশ্রুত পুত্রের যে ৫২টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা আমার মাঝে পূর্ণতা লাভ করেছে।

রাবওয়ার জলসা সালানা ঃ

১৯৪৯ সালের জলসা সালানা ১৫-১৭ এপ্রিল রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল রাবওয়ার প্রথম জলসা। এ জলসার কয়েকদিন আগে রাবওয়ার রেলওয়ে স্টেশন চালু হয়। এতে মেহমানদের খুব সুবিধা হয়। স্টেশনের কাছেই

ব্যারাক তৈরি করে মেহমানদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। জায়গার অভাবে অনেক মেহমান খুব আন্তরিকতার সাথে তাঁবু টানিয়ে থেকেছেন। একটি পাহাড়ের পাদদেশে লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করা হয়। এতে ৪৫টি তন্নুর(অর্থাৎ তন্দুর জানানোর স্থান) বানানো হয়েছিলো। ১৯৬৪ সালের জলসা মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর জীবনের শেষ জলসা। অসুস্থতার জন্য হুযূর (রাঃ) এ জলসায় যোগদান করতে পারেননি। জলসাতে হুযূরের পক্ষ হতে উদ্বোধনী ও সমাপনী বাণী পাঠ করার সৌভাগ্য লাভ করেন হযরত মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস (রাঃ)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) এর সময়ে জলসা সালানা ঃ

১৯৬৫ সালের ৮ নভেম্বর কুদরতে সানীয়ার তৃতীয় নিদর্শন হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রাহেঃ) খেলাফতের মহান আসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর খেলাফতকালে ১৬টি জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয় এবং সবকটি রাবওয়ায়। পবিত্র রমযান মাসের জন্য ১৯৬৬ সালের জলসার তারিখ পরিবর্তন করে ১৯৬৭ সালের ২৬ হতে ২৮ জানুয়ারী করা হয়। একইভাবে ১৯৬৭ সালের জলসা সালানার তারিখ পরিবর্তন করে ১৯৬৮ সালের ১১-১৩ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১১-১৩ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের জলসা পাক-ভারত যুদ্ধের কারণে স্থগিত রাখা হয়। ১৫ হিজরী শতাব্দীর প্রথম জলসা ১৯৮০ সালের ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সালের ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সালের জলসা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-এর খেলাফতকালের শেষ জলসা। এ সময়ের সকল জলসা রাবওয়ার বায়তুল আকসাতে সম্পন্ন হয়।

হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) এর খেলাফতকালীন জলসা ঃ

১৯৮২ সালে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) এর খেলাফতকাল শুরু হয়। তাঁর খেলাফতকালে ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে রাবওয়ায় জলসা সালানা হয়। পরে আইনগত কারণে রাবওয়ায় আর জলসা হতে পারে নি। ১৯৮৩ সালের জলসায় প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার মেহমান অংশ নেয়।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)

বৃটেনের জলসা সালানা ঃ

বৃটেনের জলসা সালানা শুরু হয় ১৯৬৪ সালে। ১৯৮৪ সালে আল্লাহ্তাআলার হেফাযতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) লন্ডন হিজরত করেন। এ সময় হতে বৃটেনের জলসা সালানা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। ১৯৮৪ সালের জলসা স্বাভাবিক কর্মসূচী অনুসারে ২৫ ও ২৬আগষ্ট হয়। এ কর্মসূচী পূর্বে নির্ধারণ করা ছিল। ১৯৮৫ সালের জলসা সালানা লন্ডনের সারে এলাকার টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। ৪৮টির বেশি দেশের প্রতিনিধিরা এতে যোগ দান করে। এ জলসা থেকেই লন্ডনের জলসা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেন। এ সময় থেকে হুযূর (রাহেঃ) উদ্বোধনী ও সমাপনী বক্তব্য রাখেন। ১৯৮৭ সালের জলসা সালানায় প্রথমবারের মত বিভিন্ন দেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৯৮৮ সালের জলসা সালানায় ১১৭টি দেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৯৮৯ সালের জলসা সালানা জামাতে আহমদীয়ার শতবর্ষ পূর্তি জলসা। এ জলসায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সাহাবী মৌলভী মুহাম্মদ হুসেন সাহেব অংশগ্রহণ করে জলসাকে বরকতমন্ডিত করেন। বৃটেনের জলসার সবচেয়ে বড় আকর্ষন হল আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান। ১৯৯৩ সালের জলসা থেকে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে কোটি কোটি আহমদী এতে শামিল হয়। উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালে বিশেষ কারণবশত গ্রেট বৃটেনের জলসা অনুষ্ঠিত হয়নি। হযূর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) এর ঘোষণায় এবং উপস্থিতিতে জার্মানীর জলসা আন্তর্জাতিক জলসাতে পরিণত হয়।

পঞ্চম খলীফার সময়কার জলসা ঃ

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আইঃ) খেলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর থেকে একই ক্রমধারায় জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আইঃ)

কাদিয়ানের জলসা সালানা ঃ

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সাল হতে কাদিয়ানের জলসা যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৪৭ সালের কাদিয়ান জলসায় ২৫৩ জন দরবেশ ও ৬২ জন গয়ের মুসলিম উপস্থিত ছিলেন। এরপর থেকে এ জলসা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯১ সালের কাদিয়ান জলসায় খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) যোগদান করেন। আহমদীয়াতের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৪৬ সালের পর কোন খলীফার উপস্থিতিতে কাদিয়ানে এটিই প্রথম জলসা।

৮০ তম জলসায় বক্তব্য রাখছেন ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১

৮০ তম জলসায় বক্তব্য রাখছেন এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব

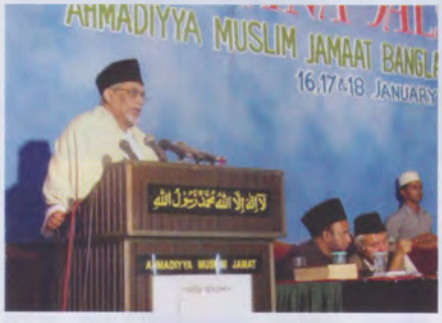

৮০ তম জলসায় বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২

৮০ তম জলসায় বক্তব্য রাখছেন মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব

৮০ তম জলসায় রেজিষ্ট্রেশনের কাজে নিয়োজিত খাদেমগণ

৮০ তম জলসায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দল

বাংলাদেশের সালানা জলসা ঃ

বাংলাদেশে প্রথম আহমদীয়াত আসে ১৯০৪ সালে, চট্টগ্রামে। ১৯১৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সর্বপ্রথম আহমদী জামাত গঠিত হয়। ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সালে। এর নামকরণ করা হয় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া'। ইমারত গঠিত হওয়ার পরই ১৯১৭ সালে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় কাদিয়ান হতে আলেমরা আসে। ১৯২২ সালের ২৬ হতে ২৮ সেপ্টেম্বর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় মাত্র ৬০ জন অংশগ্রহণ করে। ১৯২৪ সালের ১০ ও ১১ অক্টোবর ৮ম বার্ষিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের শেষ দিনে মহিলাদের অধিবেশন হয়। ১৯৩৬ সালের ২৮-৩০ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্নদা হাই স্কুলে ২০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের অধিবেশন ছিল মহিলাদের। এ জলসায় ৩০০ জন আহমদী যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালের ৬-৮ অক্টোবর 'মসজিদুল মাহ্দী' প্রাঙ্গনে ২২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় সর্বপ্রথম জামাতের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৯৫০ সালে সালানা জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। গত বছর ২০০৪ সনে এ জলসায় দেশের খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী সহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা যোগদান করে এবং আহমদীদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে জামাতে আহমদীয়ার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। মহান খোদাতাআলা জলসা সালানার এ ব্যবস্থাকে উত্তরোত্তর বরকতমন্ডিত করুন।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

৮০ তম জলসার অনুষ্ঠান ধারণরত MTA কর্মী

MTA কর্মীরা অনুষ্ঠান সম্প্রচারে ব্যস্ত

৮০ তম জলসার ইজতেমায়ী দোয়া

আর্ত মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত

ধর্মের দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে "হুকুকুল-আহ্" অর্থাৎ আল-াহ্‌র হক বা প্রাপ্য অন্যটি হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ আল-াহ্‌র সৃষ্টির হক। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের একটি মুখ্য উপায় তাঁর সৃষ্টির সেবায় রত থাকা। এই শিক্ষার উপর আহমদীয়া মুসলিম জামাত তার সীমিত সম্পদ ও শক্তি-সাধ্য নিয়ে আমল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। প্রায় এক শতাব্দীর অধিক দীর্ঘকালের মানব সেবার তালিকা প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার; তবে এই জামাতের মানব সেবামূলক কর্মকান্ডের মাঝে পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকার চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ভারত ও পাকিস্তানে চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় পরিচালনা, নির্যাতিত কাশ্মিরীদের সেবা, বিশ্বব্যাপী হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন উলে-খযোগ্য। এছাড়াও নিকট অতীতে বসনিয়ার নির্যাতিত মানবতার সেবায় আহমদীয়া জামাত অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মানব-সেবামূলক কর্মকান্ডকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে অন্যান্য অঙ্গ-সংগঠনের পাশাপাশি খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) Humanity first নামে একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। Humanity first এই নামকরণের সাথেই একটি বড় শিক্ষা আহমদীয়া মুসলিম জামাত জগতের সামনে উপস্থাপিত করছে। যে কোন বিপদগ্রস্থ মানব গোষ্ঠীর সেবা করাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। মানবতার সেবার ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ-জাত কোন কিছুই বিচার্য বিষয় নয়। বরং এক্ষেত্রে কেবল আল-াহ্‌র সৃষ্টির সেবা করাই ধার্মিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে বার বার বন্যা এবং প-াবনের সময়ও আহমদীয়া মুসলিম জামাত সীমিত জনবল ও সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

গত ২৬শে ডিসেম্বর '০৪ প্রলয়ংকারী সামুদ্রিক ভূ-কম্পন ও জলোচ্ছ্বাস বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। সুনামি নামের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস পৃথিবীর এক বড় অংশকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। গত সংখ্যায় এ সংক্রান্ত খবর ও জামাতে আহমদীয়ার ত্রাণ তৎপরতার বিষয় তুলে ধরা হয়েছিল। আমাদের হাতে প্রাপ্ত নতুন তথ্যের ভিত্তিতে আরো বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করা হল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আইঃ) গত ৩১শে ডিসেম্বর ফ্রান্সে তাঁর এক ভাষণে বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে ত্রাণ কার্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই ঘোষণা শুনার সাথে সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাত আর্ত-মানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। Humanity first এর পাশাপাশি কানাডা ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা Relief International-ও তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, ভারত ও বাংলাদেশের জামাত তাদের সাধ্যানুযায়ী ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছে। জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশের একটি বড় প্রতিনিধি দল এ বছর ১১৩তম বার্ষিক জলসা কাদিয়ানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছয় জন ত্রাণ কার্য পরিচালনা করার জন্য হুযূর আকদস (আইঃ) এর সাহায্যপুষ্ট হয়ে কাদিয়ান থেকে চেন্নাই অভিমুখে যাত্রা করেন। এই ত্রাণ দলের সদস্যরা হলেন ঃ আমীরে কাফেলা মাওলানা বশীরুর রহমান সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্, সর্বজনাব হামিদুর রহমান- সেক্রেটারী অডিও-ভিডিও, আহসানজ্জামান মাহমুদ, নাসের আহমদ, সুলতান সালাহউদ্দিন কবির ও ইকবাল হোসেন খোকন।

ডান থেকে বামে- সর্বজনাব মাওলানা বশীরুর রহমান, হামিদুর রহমান, আহসানুজ্জামান মাহমুদ, নাসের আহমদ, সুলতান সালাহউদ্দিন কবির ও ইকবাল হোসেন খোকন

The Daily Star

FOUNDER EDITOR
LATE S. M. ALI

DHAKA SATURDAY JANUARY 8, 2005

AMJB provides relief materials for tsunami victims

STAFF CORRESPONDENT

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh (AMJB) has provided medicines, foods and household articles to tsunami victims of Chennai in India, says a press release.

The AMJB, in collaboration with its Chennai unit, provided medicines to 2100 patients and household articles to 500 families in the worst affected coastal villages.

The villages are MGR Thittu, Pillumedu, Kannagi Nagar, Killai and Chinnavaikaal of Caddaloor and Chidarngaram districts.

The Ahmadiyya leaders also decided to provide fishing nets to the fisherman so that they could resume their work.

A six-member relief team headed by Bashirur Rahman, an Ahmadiyya Muslim missionary, went to Chennai on January 3.

চেন্নাই (মাদ্রাজ) আহমদী মসজিদ থেকে রওয়ানার প্রাক্কালে

চেন্নাই জামাতের আমীর জনাব বাশারত আহমদ (Basharat Ahmad) ব্যাঙ্গলোর জামাতের ডাঃ জাওওয়ায (Dr. Zawwaz) সাহেবের সার্বক্ষণিক সহযোগিতায় এক উল্লেখযোগ্য ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এছাড়াও সেখানকার সুলতান আহমদ (Sultan Ahmad) ও ফযল (Fazl) সাহেবসহ ২০ জনের একটি আহমদী স্বেচ্ছাসেবক দল বাংলাদেশ জামাতের ত্রাণ দলকে সহযোগিতা করেন। ফিরে আসার সময় স্থানীয় ডাঃ সুলতান আহমদ (Sultan Ahmad) সাহেবকে প্রায় ২৫০০ জনের জন্য পর্যাপ্ত হোমিও ঔষধ ক্রয় করে দিয়ে আসা হয়। ত্রাণ দলের কর্মী জনাব নাসের আহমদ বলেন, "আমি জন্মগত আহমদী হলেও যতই দিন যায় ততই যেন বিশ্বাস আরো বাড়ে। এই ত্রাণ তৎপরতা চালানোর সময় সেখানকার R.R. FAZL সাহেব সার্বক্ষণিক তাঁর গাড়ি আমাদের জন্য ছেড়ে দেয়। এটি আহমদীয়াত ছাড়া বিশ্বের আর কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কার্যক্রম

যুগ খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) গত ৩১/১২/০৪ তারিখে ফ্রান্সে খুতবা দেবার পর আহমদী জামাতের নিজস্ব আন্তর্জাতিক website- www.alislam.org এর মূল পৃষ্ঠায় সার্বক্ষণিক এ ত্রাণ

নাযেরে আলা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের সাথে বাংলাদেশ ত্রাণ দল

তৎপরতা জোরদার করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। Humanity First ও Relief International এর মাধ্যমে জামাতে আহমদীয়া উপদ্রুত অঞ্চলে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করছে।

শ্রীলংকা জামাতের প্রেস সেক্রেটারী জনাব আব্দুল আযীয (Abdul Aziz) জানান, শ্রীলংকার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জনাব জাফর উল্লাহ্ (Zafar Ullah) সাহেবের নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের একটি টিম শ্রীলংকার পূর্বাঞ্চলে ত্রাণ তৎপরতা চালান। ঔষধ, গৃহস্থালী দ্রব্যাদি, জীবনোপকরণ ছাড়াও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

সুমাত্রায়ও একইভাবে ত্রাণ তৎপরতা চলছে। চিকিৎসকদের একটি দল সেখান থেকে কাজ সেরে শ্রীলংকা গিয়ে পৌছেছেন।

সিদ্ধান্ত হয়েছে শ্রীলংকার পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে ও ইন্দোনেশিয়ার অচেহ প্রদেশে প্রতি পনর দিন পর পর লন্ডন থেকে গিয়ে পালাক্রমে স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক দল সেবা প্রদান করতে থাকবে।

আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ

খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) এর অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ জামাতের সদর মুরব্বী মাওলানা বশীরুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ভারতের চেন্নাইয়ে ত্রাণ বিতরণ জন্য করেছেন। জানুয়ারীর ৩ তারিখে তাদের ত্রাণ কার্যক্রম শুরু হয়। কয়েকটি উপকূলীয় অঞ্চল সফর করার পর village M G R Thittu, Pillumedu, Kannagi Nagar, killai এবং caddaloor Gi Chinnavai kaal অঞ্চলে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালায়। বাংলাদেশ দল চেন্নাই শহর হতে ২৪০ কি. মি. দূরে তাদের ত্রাণ বিতরণ কার্য পরিচালনা করে। কাদিয়ান হতে নাযেরে আলা সাহেবযাদা হযরত মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব দোয়া করে বাংলাদেশ জামাতের টিমকে বিদায় জানান।

বাংলাদেশ জামাত ১৫০০ জনকে হোমিওপ্যাথিক, ৩০০ জনকে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা দান ছাড়াও ৫০০ পরিবারের

ত্রাণ বিতরণ করছেন মাওলানা বশীরুর রহমান সাহেব

বাংলাদেশের ত্রাণকর্মীরা ট্রাকে মাল তুলছেন

সদস্যবৃন্দকে গৃহস্থালী দ্রব্যাদি, নিত্য প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ, কাপড়, বিছানার চাদর-বালিশ ইত্যাদি বিতরণ করে। চেন্নাই জামাতের সাথে মিলিতভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের জেলেদের জন্য বাংলাদেশ জামাত মাছ ধরার জালেরও ব্যবস্থা করে।

আজ থেকে শতবর্ষ আগে এ যুগের ইমাম মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) উদ্বিগ্ন, মমতাময়ী ও সন্তানদের জন্য অশ্রুবিসর্জনকারী এক মায়ের মত বলেছিলেন,

"অনুতাপকারীরা নিরাপদে থাকবে. বিপদ আসার পূর্বেই যারা ভীত হয় তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। তুমি কি মনে করছো যে, এসব ভূমিকম্প হতে তুমি নিরাপদে থাকবে? স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? কখনও নয়। মানুষের চেষ্টা সেদিন অচল হবে। মনে করো না যে, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গুরুতর ভূমিকম্প আসছে। কিন্তু তোমাদের দেশ নিরাপদে থাকবে। আমি দেখছি- হয়তো তোমরা তা হতেও গুরুতর বিপদের মুখে পড়বে। হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া। তুমিও নিরাপদ নও। **হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না।** আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য দেখছি। সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন। তাঁর সামনে বহু অন্যায় সংঘটিত হয়েছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় রূপ প্রকাশ করবেন। যার কান আছে সে শুনে নিক-সে সময় দূরে নয়। আমি সবাইকে খোদার আশ্রয়ে একত্র করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। **আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে**

ক্রোড়া জামাতের ত্রাণ কার্যক্রম

ভাসবে; লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে।

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর। তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নয়, কীট; তাঁকে যে ভয় করে না সে জীবিত নয়, মৃত" (হাকীকাতুল ওহী পুস্তক ঃ ১৯০৬ সনে রচিত)।

আমরা কি একবারও ভেবে দেখবো না পৃথিবীতে এসব নিত্য নতুন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ কি? আল-াহ্ তাঁর মসীহ্কে শতবর্ষ পূর্বে এসব আযাব সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি (আঃ) জগতের সংশোধনকল্পে এসব বিষয়ে আমাদেরকে পূর্বেই খবর দিয়েছেন। এখন আমরা কি একবারের জন্যও ভেবে দেখবো না যে, একজন মিথ্যাবাদীর কথা কি এভাবে পূর্ণ হতে পারে?

এই মানবিক বিপর্যয়ে আমরা চরমভাবে ব্যথিত এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র জামাতও এর সাধ্যমত ত্রাণ কাজ চালাতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস মযলুমরাই পারে অন্যদের কষ্ট বুঝতে। আল-াহ্তাআলা পৃথিবীর মানুষকে আহমদীয়াতের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।'

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

তারুয়া জামাতের ত্রাণ বিতরণের দৃশ্য

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

জাগ্রত বিবেকের প্রতিধ্বনি

গত ৮ই জানুয়ারী ২০০৪ তারিখে সরকারি এক ঘোষণায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আদেশ জারি হয়। এছাড়াও সমস্ত দেশজুড়ে সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের উপর চালানো হচ্ছে নির্মম নির্যাতন। এরই প্রেক্ষিতে ২০০৪ সনে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের সালানা জলসায় দেশ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের সহমর্মিতা প্রকাশ করে সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এরই অংশ বিশেষ পাঠকদের জন্য উদ্ধৃত করা হলো ঃ

বিচারপতি কে. এম. সোবহান

"…. যে আঘাত এসেছে তা সমস্ত বাংলাদেশের নাগরিকের উপর এসেছে। আহমদী সম্প্রদায়ের অনেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আজকের নিপীড়ন অত্যাচার দেখে মনে হচ্ছে পাকিস্তান হামলা চালাচ্ছে বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর। আজকে যারা এইসব হামলার নেতৃত্ব দিচ্ছে এরা বাঙালি নয়-এরা সন্ত্রাসী।"

জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

সাধারণ সম্পাদক, সি.পি.বি.

"… আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলাম প্রত্যেকটি মানুষের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য। "ধর্ম যার যার কিন্ত রাষ্ট্র" হবে সকলের"- এই হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজমের মূল ভিত্তি। যদি কোন একজন মানুষও কোন একটা ধর্মে বিশ্বাসী হয় তবে তার ধর্ম পালনের অধিকারের উপরে কোন রকমের হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের স্বাধীনতার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এটা হস্তক্ষেপ বলে আমি মনে করি।"

জনাব রাশেদ খান মেনন

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি

"… স্বাধীনতার চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়াই আমাদের লক্ষ্য। আহমদী জামাতের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন… ..।"

ব্যারিস্টার সারা হোসেন

"… আজকে আহমদীদের উপর যে হামলা চালানো হচ্ছে, আমরা মনে করি আমাদের উপর এই হামলা। আমাদের সকলের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। আমাদের সবার স্বপ্ন একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার- যেখানে স্বাধীনভাবে সবার ধর্ম পালন করার অধিকার রক্ষিত হবে…।"

জনাব মইনুদ্দিন খান বাদল

নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, জাসদ

"... আজকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ইসলামিক একটি সম্প্রদায় আহমদীয়াতের উপর তারা আক্রমণ চালাচ্ছে- এই বিবেচনায় যদি কেউ মনে করে উনারা বহাল তরবিয়তে থাকবেন- উনারা ভুল করছেন। আগামীকাল আক্রমণ যখন উনাদের উপর হবে-তখন প্রতিবাদ করার মানুষ বাংলাদেশে থাকবে না। সুতরাং প্রতিবাদ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নয়; প্রতিবাদ করতে নিজের গরজে এসেছি। ... অনেকে রেফারেন্স টানেন পাকিস্তানে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। They should very clear about one thing বাংলাদেশ পাকিস্তান নয়। আমরা একটা সেক্যুলার ডেমোক্রেটিক দেশ করার জন্য যুদ্ধে গিয়েছিলাম ...।"

এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র

"... আমরা মনে করি এটা সংবিধানের সরাসরি লঙ্ঘন। আমরা মনে করি যে এটা মানবাধিকারের যেকোন সূত্রের সরাসরি অপমান। আমরা মনে করি এটা মানবতার অবমাননা - এবং আমরা সবাই অপমানিত বোধ করছি। ...আমরা জানি যে, অন্যায় যতই শক্তিশালী হয়ে উঠুক না কেন, সেটা কোন দিন ন্যায়ে পরিণত হবে না। মিথ্যা যতই শক্তি সঞ্চয় করুক না কেন সেটা কোনদিন সত্যে পরিণত হবে না। এবং অন্যায় ন্যায়ের কাছে পরাজিত হবেই, অসত্য সত্যের কাছে পরাজিত হবেই।' ...রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-"নিষ্ফলা জেনেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাওয়া প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য।"

জনাব শাহ্‌রিয়ার কবির

সভাপতি, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। সাধারণ সম্পাদক, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন, সম্পাদক, লেখক, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা

"...বাংলাদেশের ইতিহাস পাকিস্তান, আফগানিস্তানের ইতিহাস নয়। বাংলাদেশ আমরা ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ শহীদদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন করেছি। ১৯৯৫ সালে তারা হুমকি দিয়েছিল, এই কমপ্লেক্স ধ্বংস করবে। আমরা সেদিন এক দেড় হাজার লোক শহীদ মিনারে জড়ো হয়েছিলাম। অধ্যাপক কবির চৌধুরী, কবি শামসুর রহমান, বিচারপতি কে. এম. সোবহান থেকে শুরু করে দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী লাঠি হাতে বলেছিলেন, বকশী বাজারে হামলা করতে হলে আমাদের বুকের উপর দিয়ে যেতে হবে...।"

সংকলনে ঃ সিবগাতুর রহমান মুকুল

খেলাফতে আহমদীয়ার কতিপয় ঐতিহাসিক ছবি

কানাডা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)

খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম ভাষণদানরত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)

১৯৭৪সনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে জামাতে আহমদীয়ার পক্ষে
বক্তব্য দিতে যাবার প্রাক্কালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)

গুয়েতেমালার রাষ্ট্রপতির সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)

১৯৯০ সনে বাদ জুমুআ মধ্যাহ্নভোজে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)

১৯৯১ সনে গুয়েতেমালা সফরকালে স্থানীয় ভারতীয় চিফগণের
সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)

বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মসজিদ

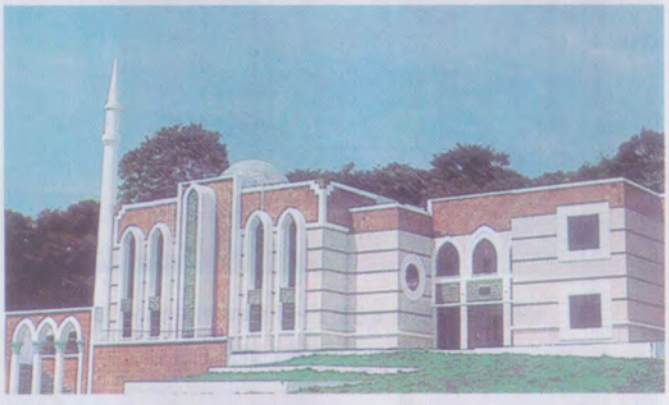

মসজিদ বায়তুল আওওয়াল, গুয়েতেমালা

মসজিদ মুবারক, কাদিয়ান

নাসের মসজিদ, সুরিনাম

রহিম মসজিদ, ত্রিনিদাদ

মসজিদ বাশারাত, স্পেন

মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন

বায়তুল হুদা মসজিদ, অষ্ট্রেলিয়া

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কতিপয় প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণার অসাংবিধানিক আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দেশের ৬টি শীর্ষ স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একজন বিশিষ্ট সদস্য জনাব এ. কে. রেজাউল করীম (ব্যক্তিগতভাবে) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে এক রীট পিটিশন দায়ের করেন।এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জনাব এ. কে. রেজাউল করীম আমাদেরকে প্রদান করেন যা নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা হল ঃ সম্পাদক

কুরআন মজীদ, পাক্ষিক আহমদীসহ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দশটি পুস্তিকা ও দশটি প্যাম্পলেট নিষিদ্ধ করণের অসাংবিধানিক সরকারী আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রীট

২০০৪ইং সনের ৮ই জানুয়ারী তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের জাতীয় পত্রিকাগুলোতে এক নির্দেশ ছাপিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের নিম্নোক্ত বইপত্র নিষিদ্ধ ঘোষনা করে।

বই-পুস্তকসমূহ ঃ (১) আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদের বাংলা ভাষা বা অন্য কোন ভাষায় তার অনুবাদ বা ব্যাখ্যা। (২) পাক্ষিক আহমদী (৩) জিহাত বিল কোরআন (৪) ইয়াসসারনাল কোরআন (৫) কৃষ্ণের বিশরুপ ও কল্কী জগৎপতি (৬) ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন (৭) উম্মতী নবী (৮) খাতামান নবীঈন (৯) মহাসুসংবাদ (১০) তরবীয়াতে আওলাদ।

বুকলেট ও লিফলেট ঃ (১) মহা জিজ্ঞাসা (২) ডিস এন্টিনা (৩) শুভ সংবাদ ও আমন্ত্রণ (৪) অমুসলিম ঘোষণার অ-ইসলামী দাবী (৫) প্রতিশ্রু চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ (৬) সহজ সমাধানে আসুন (৭) মুসলমান কে? (৮) দাজ্জাল ও তাহার গাঁধা (৯) আহমদিয়্যাতের পয়গাম (১০) বাংলাদেশের ভাই বোনদের কাছে সবিনয় আবেদন।

সরকারের উপর্যুক্ত নিষিদ্ধ ঘোষনার অসাংবিধানিক আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ছয়টি শীর্ষ স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে গত ২০.১২.২০০৪ইং তারিখে এক রীট পিটিশন (WRIT PETITION NO 7031/2004) মাননীয় বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক মহোদয়ের অবকাশকালীন একক বেঞ্চে দাখিল করা হয়। শুনানীর পর মাননীয় বিচারপতি হাইকোর্ট খোলার দিন ০২.০১.০৫ ইং পর্যন্ত সরকারের আদেশটির কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন, আল্ হামদুলিল্লাহ্।

দেশের নিম্নবর্ণিত শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন ও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একজন সাধারণ সদস্য, ব্যক্তিগতভাবে খাকসার (এ. কে. রেজাউল করীম) এ রীটটি দায়ের করে।

মানবাধিকার সংস্থাসমূহ ঃ
১। অধিকার
২। সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন
৩। আইন ও শালিস কেন্দ্র
৪। কর্মজীবী নারী
৫। জাতীয় আইনজীবি পরিষদ
৬। নিজেরা করি

০২.০১.০৫ইং তারিখে হাইকোর্ট খোলার দিনে মাননীয় বিচারপতি এম. এ. মতিন ও বিচারপতি এ. এফ. এম. আব্দুর রহমান সাহেবদ্বয়ের বেঞ্চে রীট আবেদনটির পূর্ণাঙ্গ শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীশেষে মাননীয় বিচারপতিদ্বয় সরকার কর্তৃক আহমদীয়া জামাতের বইপত্র ও প্রকাশনাসমূহের নিষেধাজ্ঞা ও এর গেজেট নোটিফিকেশন কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না– মর্মে সরকারের প্রতি দু'সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শাতে এবং এ আদেশের কার্যকারিতা তিন সপ্তাহ পর্যন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন।

ঢাকা হাইকোর্ট ২৯.০১.০৫ইং পর্যন্ত আবারও ঈদুল আযহার ছুটি থাকবে এবং ছুটির মধ্যেই এ রীটের স্থগিতাদেশের সময় শেষ হবে বিধায়, রীট আবেদনটি (নং ৭০৩১/২০০৪) ১৬ই জানুয়ারী ২০০৫ইং তারিখে মাননীয় বিচারপতি শাহ্ আবু নঈম মোমেনুর রহমান ও বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী সমন্বয়ে গঠিত ফুল বেঞ্চে স্থগিতাদেশ বর্ধিত করণের জন্য উত্থাপিত হয়। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় আগামী ৪ (চার) মাস পর্যন্ত এ আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার আদেশ প্রদান করেন।

এ রীটটি কোর্টে পেশ করেন দেশের প্রখ্যাত আইনজীবি ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডঃ কামাল হোসেন এবং তাঁকে সহায়তা করেন ব্যারিষ্টার তানজিবউল আলম, ব্যারিষ্টার সারা হোসেন, ব্যারিষ্টার সালাহ্উদ্দিন আহমদ ও ডঃ জহির সহ মানবাধিকার সংগঠন সমূহের আরও অনেক আইনজীবি। আল্লাহ্তাআলা এদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

এ. কে. রেজাউল করীম

সাম্প্রতিককালে জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশের বিরোধিতা

ধর্ম জগতের সূচনালগ্ন হযরত আদম (আঃ)-এর যুগ থেকে সত্যের ধারক ও বাহক মহাপুরুষগণ ও তাঁদের অনুসারীরা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে এসছেন। সত্যের অস্বীকারকারীরা সম্ভাব্য যত পন্থায় সম্ভব তাঁদের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু পরিণামে তাঁরাই (মহাপুরুষ ও তাঁর অনুসারীরা) জয়ী হয়েছে। নবীকূল শিরোমণি, খাতামান্নাবীঈন 'হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জাতির পক্ষ থেকে সবচে' বেশি বিরেধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। সেখানে তাঁর (সাঃ) শিষ্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ও তাঁর জামাতের বিরোধিতা হবে না সেটা আমরা আশা করতে পারি না। শুরু থেকেই এ জামাতের বিরোধিতা হয়ে আসছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ব্যাপক বিরোধিতা হয় ১৯৮৭ সালের ২৭শে এপ্রিলে বি-বাড়িয়াতে। তারা আমাদের সেখানকার প্রধান মসজিদ দখল করে নেয়। আমাদের অনুষ্ঠানে আক্রমণ করে দুজনকে শহীদ করে। পরবর্তীতে তারা ১৯৯২ সালে ২৯শে ফেব্রুয়ারি খুলনাতে এবং ২৯শে অক্টোবর ঢাকার বকশি বাজারের মসজিদে আক্রমণ করে।

১৯৯৯ সালের ৮ই অক্টোবর জুমআর নামায চলা অবস্থায় বিরুদ্ধবাদীরা এক শক্তিশালী টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শহীদ করে আমাদের সদস্যদেরকে। আহত হন ৩০ জন। তারা দুটি বোমা ঢাকার বকশি বাজার মসজিদেও রেখেছিল কিন্তু তা বিস্ফোরিত হয়নি। সেই বিরোধিতা আজও অব্যাহত রয়েছে।

সাম্প্রতিক কালের কিছু বিরোধিতার চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো–

গত ২৪-০৮-২০০৩ইং কুষ্টিয়ায় আমাদের উত্তর ভাবানীপুর জামাতে মোখালেফাত শুরু হয়। স্থানীয় মসজিদের ইমামের উস্কানী ও নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা আহমদীদের অবরুদ্ধ করে রাখে। এ সময় আহমদীদের ক্ষেতে ফসল, জিনিসপত্র বিরুদ্ধবাদীরা লুট করে নিয়ে যায়। এ অবস্থা কয়েক সপ্তাহ চলে।

গত ২-১১-২০০৩ইং যশোরের রঘুনাথপুর বাগ জামাতে আমাদের মসজিদ ও প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ শাহ আলম সাহেবের বাড়িতে স্থানীয় এক মসজিদের ইমামের (জামাতে ইসলামীর মৌলভী) নেতৃত্বে একদল উগ্রপন্থী মৌলবাদী আক্রমণ চালায়। এতে আমাদের প্রেসিডেন্ট জনাব শাহ আলম সাহেব গুরুতর আহত হন। শাহাদত বরণ করেন। ইন্না... ....রাজেউন। এছাড়াও ঐ দিনের আক্রমণে আরও ১০ জন আহত হন।

গত১৯-০৩-২০০৪ইং শুক্রবার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মৌলবাদীরা আমাদের বরগুনার কুকুয়া কৃষ্ণনগর ও খাকদান জামাতের তিনটি মসজিদ দখলের অপচেষ্টা করে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয়ে পরে তারা স্থানীয় কুকুয়া হাইস্কুল মাঠে সমাবেশ করে।

গত ১২-০৫-২০০৪ইং উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী আমাদের পটুয়াখালী জামাতের মসজিদ ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। তারা ঐ সময় মসজিদ জবর-দখলেরও চেষ্টা করে। কিন্তু প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তারা সফল হতে পারেনি।

গত১৩-৫-২০০৪ইং রংপুর জামাতের বদরগন্জে মৌলবাদীরা হামলা চালিয়ে ৮টি পরিবারের বাড়িঘর ভাঙ্গচুর ও লুট করে। তারা সেখানে অমানুষিক নির্যাতন ও মধ্যযুগীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত আহমদীদের অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

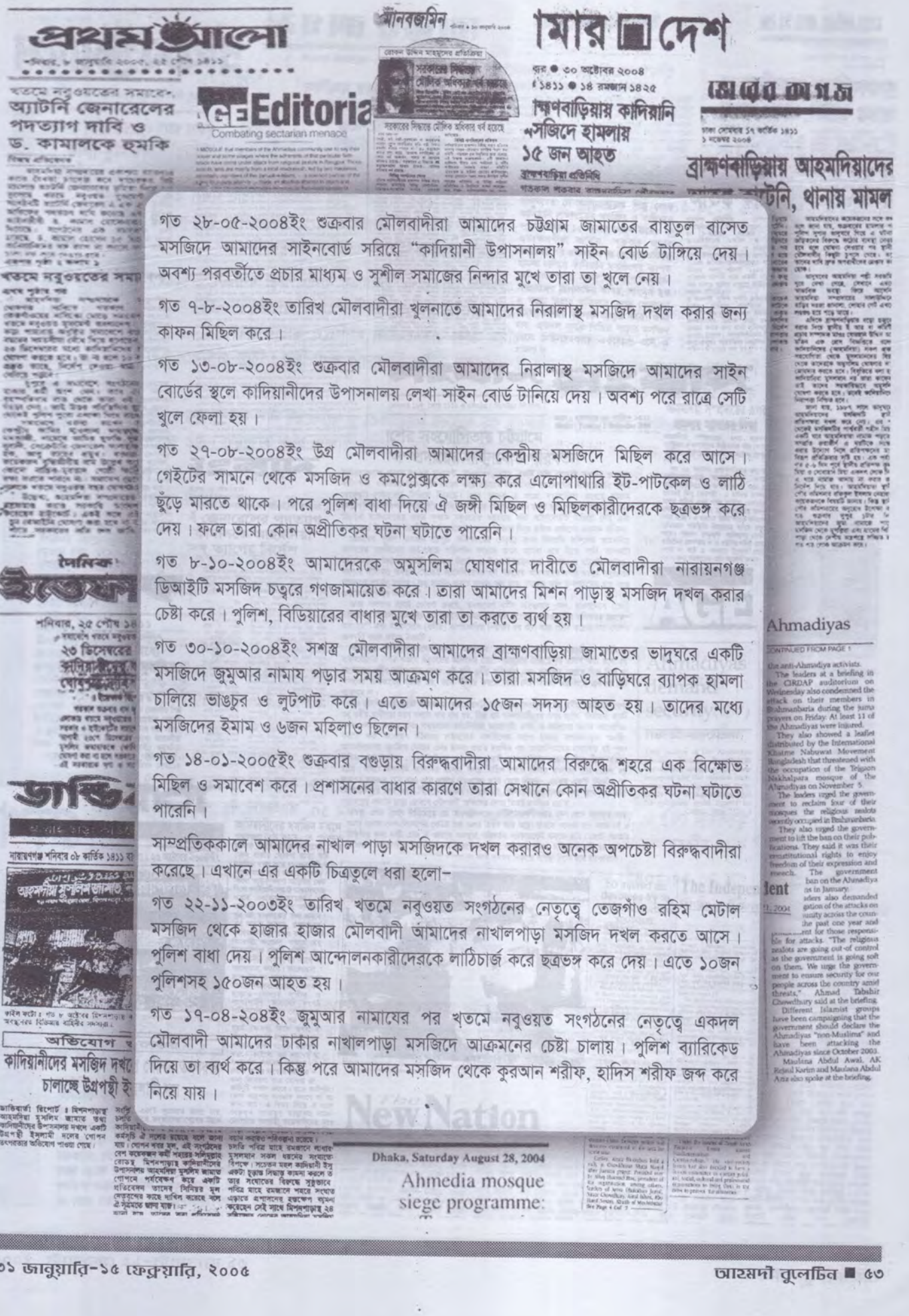

গত ২৮-০৫-২০০৪ইং শুক্রবার মৌলবাদীরা আমাদের চট্টগ্রাম জামাতের বায়তুল বাসেত মসজিদে আমাদের সাইনবোর্ড সরিয়ে "কাদিয়ানী উপাসনালয়" সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে দেয়। অবশ্য পরবর্তীতে প্রচার মাধ্যম ও সুশীল সমাজের নিন্দার মুখে তারা তা খুলে নেয়।

গত ৭-৮-২০০৪ইং তারিখ মৌলবাদীরা খুলনাতে আমাদের নিরালাস্থ মসজিদ দখল করার জন্য কাফন মিছিল করে।

গত ১৩-০৮-২০০৪ইং শুক্রবার মৌলবাদীরা আমাদের নিরালাস্থ মসজিদে আমাদের সাইন বোর্ডের স্থলে কাদিয়ানীদের উপাসনালয় লেখা সাইন বোর্ড টানিয়ে দেয়। অবশ্য পরে রাত্রে সেটি খুলে ফেলা হয়।

গত ২৭-০৮-২০০৪ইং উগ্র মৌলবাদীরা আমাদের কেন্দ্রীয় মসজিদে মিছিল করে আসে। গেইটের সামনে থেকে মসজিদ ও কমপ্লেক্সকে লক্ষ্য করে এলোপাথারি ইট-পাটকেল ও লাঠি ছুঁড়ে মারতে থাকে। পরে পুলিশ বাধা দিয়ে ঐ জঙ্গী মিছিল ও মিছিলকারীদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ফলে তারা কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে পারেনি।

গত ৮-১০-২০০৪ইং আমাদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে মৌলবাদীরা নারায়নগঞ্জ ডিআইটি মসজিদ চত্বরে গণজামায়েত করে। তারা আমাদের মিশন পাড়াস্থ মসজিদ দখল করার চেষ্টা করে। পুলিশ, বিডিয়ারের বাধার মুখে তারা তা করতে ব্যর্থ হয়।

গত ৩০-১০-২০০৪ইং সশস্ত্র মৌলবাদীরা আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের ভাদুঘরে একটি মসজিদে জুমুআর নামায পড়ার সময় আক্রমণ করে। তারা মসজিদ ও বাড়িঘরে ব্যাপক হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এতে আমাদের ১৫জন সদস্য আহত হয়। তাদের মধ্যে মসজিদের ইমাম ও ৬জন মহিলাও ছিলেন।

গত ১৪-০১-২০০৫ইং শুক্রবার বগুড়ায় বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের বিরুদ্ধে শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। প্রশাসনের বাধার কারণে তারা সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে পারেনি।

সাম্প্রতিককালে আমাদের নাখাল পাড়া মসজিদকে দখল করারও অনেক অপচেষ্টা বিরুদ্ধবাদীরা করেছে। এখানে এর একটি চিত্রতুলে ধরা হলো–

গত ২২-১১-২০০৩ইং তারিখ খতমে নবুওয়ত সংগঠনের নেতৃত্বে তেজগাঁও রহিম মেটাল মসজিদ থেকে হাজার হাজার মৌলবাদী আমাদের নাখালপাড়া মসজিদ দখল করতে আসে। পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশ আন্দোলনকারীদেরকে লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে ১০জন পুলিশসহ ১৫০জন আহত হয়।

গত ১৭-০৪-২০৪ইং জুমুআর নামাযের পর খতমে নবুওয়ত সংগঠনের নেতৃত্বে একদল মৌলবাদী আমাদের ঢাকার নাখালপাড়া মসজিদে আক্রমনের চেষ্টা চালায়। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে তা ব্যর্থ করে। কিন্তু পরে আমাদের মসজিদ থেকে কুরআন শরীফ, হাদিস শরীফ জব্দ করে নিয়ে যায়।

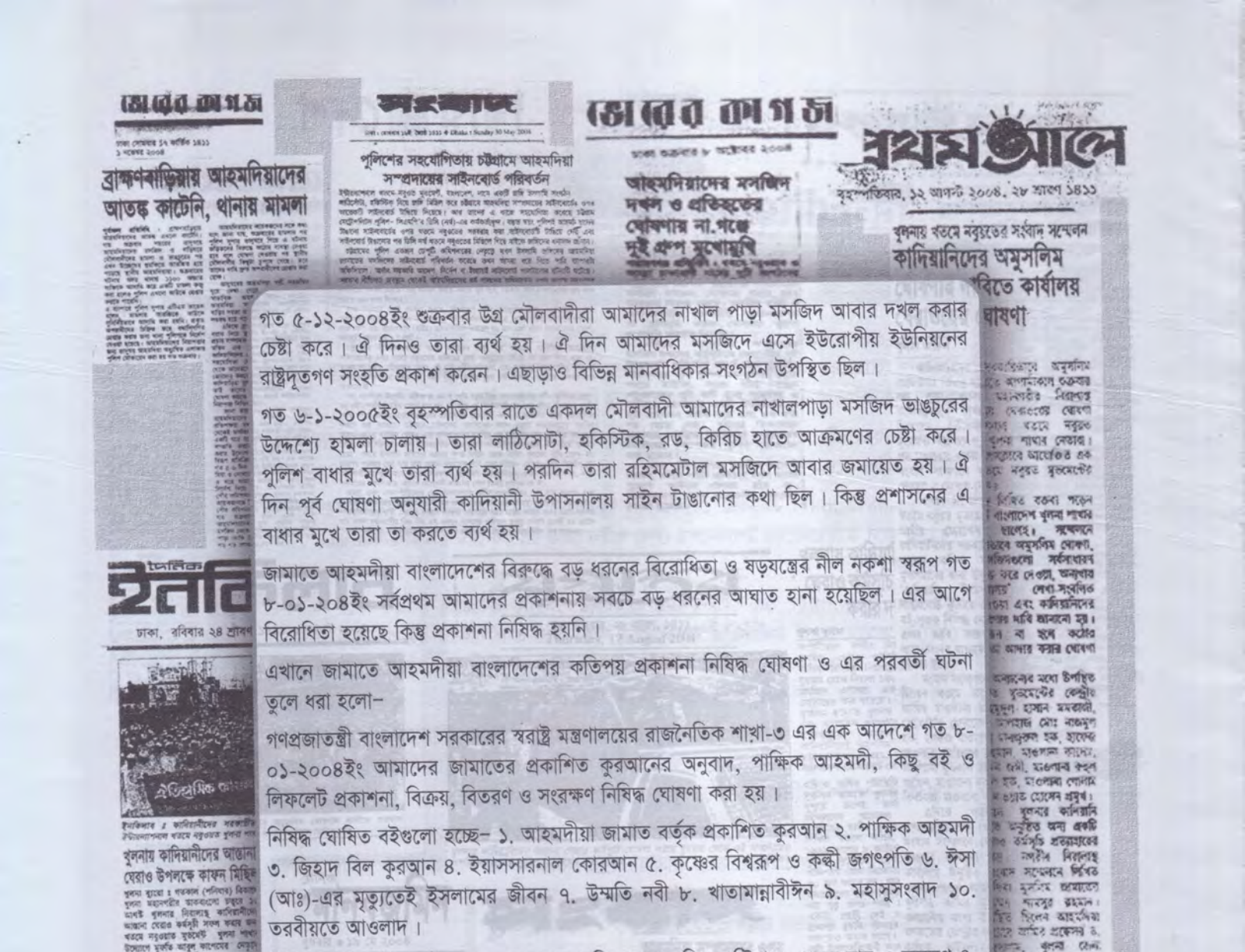

গত ৫-১২-২০০৪ইং শুক্রবার উগ্র মৌলবাদীরা আমাদের নাখাল পাড়া মসজিদ আবার দখল করার চেষ্টা করে। ঐ দিনও তারা ব্যর্থ হয়। ঐ দিন আমাদের মসজিদে এসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতগণ সংহতি প্রকাশ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন উপস্থিত ছিল।

গত ৬-১-২০০৫ইং বৃহস্পতিবার রাতে একদল মৌলবাদী আমাদের নাখালপাড়া মসজিদ ভাঙচুরের উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। তারা লাঠিসোটা, হকিস্টিক, রড, কিরিচ হাতে আক্রমণের চেষ্টা করে। পুলিশ বাধার মুখে তারা ব্যর্থ হয়। পরদিন তারা রহিমমেটাল মসজিদে আবার জমায়েত হয়। ঐ দিন পূর্ব ঘোষণা অনুযারী কাদিয়ানী উপাসনালয় সাইন টাঙানোর কথা ছিল। কিন্তু প্রশাসনের এ বাধার মুখে তারা তা করতে ব্যর্থ হয়।

জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বড় ধরনের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের নীল নকশা স্বরূপ গত ৮-০১-২০৪ইং সর্বপ্রথম আমাদের প্রকাশনায় সবচে বড় ধরনের আঘাত হানা হয়েছিল। এর আগে বিরোধিতা হয়েছে কিন্তু প্রকাশনা নিষিদ্ধ হয়নি।

এখানে জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশের কতিপয় প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা ও এর পরবর্তী ঘটনা তুলে ধরা হলো–

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক শাখা-৩ এর এক আদেশে গত ৮-০১-২০০৪ইং আমাদের জামাতের প্রকাশিত কুরআনের অনুবাদ, পাক্ষিক আহমদী, কিছু বই ও লিফলেট প্রকাশনা, বিক্রয়, বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

নিষিদ্ধ ঘোষিত বইগুলো হচ্ছে– ১. আহমদীয়া জামাত বর্তৃক প্রকাশিত কুরআন ২. পাক্ষিক আহমদী ৩. জিহাদ বিল কুরআন ৪. ইয়াসসারনাল কোরআন ৫. কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ও কল্কী জগৎপতি ৬. ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন ৭. উম্মতি নবী ৮. খাতামান্নাবীঈন ৯. মহাসুসংবাদ ১০. তরবীয়তে আওলাদ।

নিষিদ্ধ ঘোষিত লিফলেটগুলো হচ্ছে– ১.মহা জিজ্ঞাসা ২. ডিস এন্টিনা ৩. শুভসংবাদ ও অমন্ত্রণ ৪. অমুসলিম ঘোষনার অ-ইসলামী দাবী ৫. প্রতিশ্রুতি চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ ৬. সহজ সমাধানে আসুন ৭. মুসলমান কে? ৮. দাজ্জাল ও তার গাধা ৯. আহমদীয়াতের পয়গাম ১০. বাংলাদেশের ভাইবোনদের কাছে সবিনয় আবেদন।

গত ২০-১২-২০৪ইং আমাদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করা হয়। ঐ দিন বিচারপিতি এবিএম খায়রুল হকের অবকাশকালীন বেঞ্চে আংশিক শুনানি হয় এবং শুনানি না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকারের দেওয়া আদেশের কোন গেজেট নোটিফিকেশন জারি করা যাবে না– সরকারের আইন কর্মকর্তার পক্ষ থেকে আদালতকে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

গত ২১-১২-২০০৪ইং মঙ্গলবার হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করে স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের দেওয়া আদেশ এবং তা গেজেট আকারে প্রকাশের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। আগামী ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত হাইকোর্ট এ স্থগিতাদেশ দেয়।

devotees try to storm Ahmadiya mosque

The Independent
SATURDAY, AUGUST 21, 2004

সংবাদ

পুলিশের সহযোগিতায় চট্টগ্রামে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সাইনবোর্ড পরিবর্তন

গত ২-১-২০০০ইং তারিখ আমাদের প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করে স্বরাষ্টমন্ত্রণালয়ের দেওয়া আদেশ এবং তা গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ থেকে আগামী ২ সপ্তাহ বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। একই সাথে সরকারের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দর্শাতে সরকারের প্রতি রুলনিশি জারি করা হয়েছে। বিচারপ্রতি মোঃ আব্দুল মতিন ও বিচারপতি এ এফ এম আবদুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

হাইকোর্ট ১৬ই জানুয়ারি '০৫ তারিখে আগামী ৪ মাস এ আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার আদেশ প্রদান করেন। বিরুদ্ধবাদীদের এসব বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র কখনও জামাতে আহমদীয়ার অগ্রগতি ও উন্নতিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বিগত ১শ ১৬ বছর যাবত জামাতে আহমদীয়ার অবিরাম চরম বিরোধিতা হয়েছে। কিন্তু এর মোকাবেলায় জামাত অত্যন্ত দ্রুততার সাথে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অচেনা গ্রাম কাদিয়ান থেকে উৎসারিত নাম আহমদীয়াত আজ সারা বিশ্বে সুপরিচিত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও এই চিত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গন্ডি থেকে বের হয়ে আজ আহমদীয়া সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এর উন্নতি ও প্রসারের গতি আরও দ্রুত হবে এটা আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা।

শেষে আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ঈমান উদ্দীপক ও তেজোদীপ্ত বাণী যা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত প্রেরণা জোগাচ্ছে তা শুনিয়ে লেখা শেষ করছি। হয়রত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, "হে মানব সকল! শ্রবণ করো! কেননা এটা সেই সত্ত্বার ভবিষ্যদ্বাণী যিনি আকাশ ও পৃথিবীতে আছেন। তিনি তাঁর এই জামাতকে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিবেন আর অকট্য যুক্তি ও দলিল বলে অন্যান্য সবার উপর এদেরকে জয়যুক্ত করবেন। সেই সময় সমাগত বরং সন্নিকটে যখন পৃথিবীতে এটাই একমাত্র মতবাদ হবে যাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। খোদাতাআলা এই মতবাদ আর এই জামাতকে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের অসাধারণ আশিষ বর্ষণ করবেন।" (তাজকিরাতুশ শাহাদাতাইন-৬৬)।

তিনি (আঃ) আরও বলেন, "আমি নিশ্চিত, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন আর আমাকে তিনি কখনও বিনিষ্ট করবেন না। সমগ্র জগত যদি আমার বিরোধিতায় হিংস্র পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে তবুও তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। আমি কোন ক্রমেই ব্যর্থতা নিয়ে কবরে যাব না। কেননা, আমার খোদা প্রতিটি প্রদক্ষেপে আমার সাথে আছেন আর আমি তাঁর সাথে আছি। আমার অন্তর সম্পর্কে তিনি যেভাবে অবগত, তেমনিভাবে অন্য কেউ অবগত নয়। যদি সমস্ত মানুষ আমাকে পরিত্যাগ করে তাহলে খোদাতাআলা আরেকটি নতুন জাতি সৃষ্টি করে দিবেন যারা আমার সঙ্গী হবে। নির্বোধ বিরুদ্ধবাদী মনে করে, তাদের চক্রান্তে ও পরিকল্পনায় এই কার্যক্রম পন্ড হয়ে যাবে। আর এই জামাতের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু এই বোকারা জানে না আকাশে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, পৃথিবী তা মুছে দেওয়ার শক্তি রাখে না।" (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড)।

–শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমিন

ধৈর্য্য ও সাহসিকতা

আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) কে মহা মানব হিসাবে পাঠান। সে জন্য তার দায়িত্ব ছিল মহান। আর এই মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য, আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআনে আঁ-হযরত (সঃ)-কে বলেছেন "হে যারা ঈমান এনেছ তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে আছেন (২ঃ১৫৪)।

বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উপর বাংলাদেশের একদল উগ্রপন্থি মৌলবাদী গোষ্ঠী তাদের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের প্ররোচনায় সরকার পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বই পুস্তক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যশোর জেলার ঝিকরগাছার রঘুনাথপুরবাগ জামাতে আহমদীয়ার স্থানীয় ঈমাম শাহ্ আলম সাহেবকে প্রকাশ্য দিনের আলোয় নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। কুষ্টিয়া ভেড়ামারার আহমদী সতেরটি পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া সবসময় জামাতে আহমদীয়া আজ তাদের হুমকির মুখোমুখি দাড়িয়ে আছে। এমতাবস্থায় আহমদী সদস্যদের করণীয় কি হতে পারে? এমন বিপদ মুহূর্তে আঁ-হযরত (সঃ) কি করতেন? সাবে আবু তালেবের তিন বছর যখন মুসলমানদিগকে বয়কট করে রাখা হয়েছিল, তখন আঁ-হযরত (সঃ) এর জীবনে এবং তার সাহাবাদের জীবনে কি নমুনা আমরা দেখতে পাই, সেই নমুনাগুলি আমাদের সামনে সর্বদাই রাখতে হবে। শুরুতে যে আয়াতটি তুলে ধরলাম, তাতে আল্লাহ্‌তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে বিপদাবলীর দিনগুলিতে যে বিষয়ে খোদাতাআলার কাছে চাইতে বলা হয়েছে তা হল তোমরা ধৈর্য্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।' 'হে বন্ধুগণ বিপদের দিনগুলিতে নিজেদের বানোয়াটি কোন অস্ত্র নয়, সে দিন অস্ত্র হবে নামাযের মাধ্যমে খোদাতাআলার সাহায্য প্রার্থনা করা। এছাড়া সেদিন আমাদের আর কোন প্রস্তুতি যেন না থাকে, প্রস্তুতি শুধু একটাই। এখন খোদাতাআলার ডংকা পূর্ণোদ্যমে বাজতে প্রস্তুত। হ্যাঁ তোমাদিগকে হ্যাঁ তোমাদিগকে হ্যাঁ তোমাদিগকে, খোদাতাআলা আবার তার ডংকা বাজানোর দায়িত্ব অর্পন করেছেন। হে ঐশী রাজত্যের বংশীবাদকগণ! হে ঐশী রাজত্যের বংশীবাদকগণ, হে ঐশী রাজত্যের বংশীবাদকগণ এ ডংকায় এতজোরে আঘাত হানো যেন দুনিয়ার কর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যায় আরো একবার নিজেদের ধমণীর রক্ত এই সিংগায় ভরে দাও যেন আরশের স্তম্ভগুলি নড়ে উঠে। এবং আকাশের ফেরেশ্‌তাগণও কেঁপে উঠে। যাতে করে তোমাদের বেদনাদায়ক চিৎকার এবং তোমাদের নারায়ে তাকবীর, নারায়ে শাহাদাতের, তৌহিদের কারণে আল্লাহ্‌তাআলা পৃথিবীতে অবতরণ করেন। যেন খোদার রাজত্ব দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সোজা এসো আর খোদার সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে যাও। মুহাম্মদ (সঃ) এর রাজত্ব আজ মুসায়ী মসিহ কেড়ে নিয়েছে, তোমরা মুসায়ী মসিহ থেকে কেড়ে নিয়ে এ রাজত্ব মুহাম্মদ (সঃ) এর সামনে পেশ কর। আর মুহাম্মদ (সঃ) এ রাজত্বকে খোদাতাআলা সামনে পেশ করবে" (মুসলেহ মাওউদ। সয়য়ারে রূহানী ৩য় খন্ড পৃঃ ২৮২)।

হে ঐশী রাজত্যের বংশীবাদকগণ! এ ডংকায় এতজোরে আঘাত হানো যেন দুনিয়ার কর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যায় আরো একবার নিজেদের ধমণীর রক্ত এই সিংগায় ভরে দাও যেন আরশের স্তম্ভগুলি নড়ে উঠে। এবং আকাশের ফেরেশ্‌তাগণও কেঁপে উঠে। যাতে করে তোমাদের বেদনাদায়ক চিৎকার এবং তোমাদের নারায়ে তাকবীর, নারায়ে শাহাদাতের, তৌহিদের কারণে আল্লাহ্‌তাআলা পৃথিবীতে অবতরণ করেন।

হে বন্ধুগণ তায়েফের ঘটনা আমরা সকলেই জানি, সেদিন রাসূলে করীম (সঃ) কে বলা হয়েছিল "হে আল্লাহ্‌র রাসূল মানুষ ঈমান আনে না বলে তুমি তোমার জীবনকে ধ্বংস করে দিবে? হে মুহাম্মদ (সঃ) তোমার জীবনের উদ্দেশ্য তো অন্য। তুমি কেন নিজের জীবনকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছ। হে মুহাম্মদ মুস্তফা আরাবি (সঃ) তুমি বল তায়েফের দুই পার্শ্বের দুই পাহাড়ে তায়েফ বাসীকে পিষে রেখে দেই। সে দিন রাসূলে করীম (সঃ) এর জীবনে চরম ধৈর্য্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ এক নমুনা আমরা দেখতে পাই। এদের ক্ষমা কর প্রভু। এদের জ্ঞান দাও এ প্রার্থনার মাধ্যমে খোদাতাআলা তায়েফ বাসীদের উপর রহমত বর্ষিত করেছিলো। আর তার ফল হল আজ অবদি মুসলমান ব্যতীত সেখানে অন্য কোন ধর্মাবলম্বী নাই। "পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "তারাই বীর, যুদ্ধ উপস্থিত হলে বা কোন বিপদ ঘটলে যারা তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না, তাদের জেহাদও কঠিন সময়ে খোদার সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে (২ঃ১৭৮, ১৩ঃ২৩)।

এ প্রসঙ্গে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, প্রকৃত বীরত্বের মূল ধৈর্য্য ও স্থিরতা। প্রবৃত্তির যাবতীয় উত্তেজনা কিংবা শত্রুবৎ বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৃঢ় থাকা এবং কাপুরুষদের ন্যায় পলায়ন না করাই বীরত্ব (ইসলামী নীতি দর্শন, পৃঃ ৬৪)।

এই চারিত্রিক গুণের নামই হল ধৈর্য্য। আমরা যেন দৃঢ় সংকল্পের সাথে অগ্রসর হই। এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে আমার পশ্চাৎপদ যেন না হই, বরণ সম্মুখে যেন অগ্রসর হই। বিনা বিরক্তিতে দুঃখ যন্ত্রণা খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে বরং করে লই, আমরা যেন আমাদের বিবেকের আহ্বানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে রাখি।

এ থেকে যেন ভুল পরিমাণও বিচ্যুত না হই। আমাদের সব সময় এই কথা মনে রাখতে হবে ধৈর্য্যের মধ্যে কৃতকার্যের সুবর্ণনীতি বিদ্যমান, কেননা সফলতা লাভের চাবিকাটি হল ধৈর্য্যের মধ্যে। বর্তমানে আমাদের ধৈর্য্যের মান ও সাহসিকতাকে সমুন্নত রাখা খুবই জরুরী। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জীবনে সাহসিকতা ও ধৈর্যকে সমুন্নত না রাখাব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হতে পারে না। সুতরাং সমুদ্র গ্রাসে সাহস ও ধৈর্য্য ভবিষ্যতে জামাতের জন্য উপযোগী একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। যারা জামাতের জন্য চিন্তা করেন এবং কিছু একটা করার চেষ্টা করেন, তাদের উচিত সর্বপ্রথমে তাদের সন্তানদের ধৈর্য্য ও সাহসিকতাকে সমুন্নত রাখা। আর সেজন্য নিজেদেরকে সন্তানদের সামনে ধৈর্য্যের নমুনা পেশ করতে হবে। ছোট খাটো ব্যাপারে উত্তেজিত হওয়া এবং

সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করা ঠিক নয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর রাবে (রাহেঃ) বলেন, "যেসব গৃহে শিশু সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার হতে থাকে সেখানে ভবিষ্যতের জাতি বা বংশধরদের মধ্যে বড় ধরনের আত্মসংযম ও সাহস এবং সহনশীলতার উন্মেষ ঘটতে পারে না।" (সূত্র - খুৎবা জুমুআ ১৯৮৯ তরবিয়তের গোড়ার কথা)।

একবার হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) শৈশবে খেলা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর মূল্যবান প্রবন্ধ পুড়ে ফেললেন। যে প্রবন্ধটি প্রেসে ছাপানোর জন্য প্রস্তুত করেছিলেন হযরত (আঃ)। এই কান্ড দেখে বাড়ির সকলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই জন্য যে কি শাস্তি না তাকে দেয়া হবে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যখন ঘটনা জানতে পারলেন বললেন, " কোই বাত নেহী খোদা আওর ভী তৌফিক দে দেগা"। দুশ্চিন্তার কারণ নেই খোদা আবারও লেখবার তৌফিক দিবেন। উপরোক্ত ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) ১৯৮৯ সনে তাঁর খুতবা জুমুআয় বলেন, অতএব ধৈর্য্য ও উদারতা নিজেদের আমল ও ব্যবহারিক আদর্শ দ্বারা সৃষ্টি করতে হয়। যে সকল পিতামাতার অন্তরে আত্মসংযমের ও সহনশীলতার গুণ নেই তারা সন্তানদের মধ্যে সাহস, সংযম ও সহনশীলতার সঞ্চার ঘটাতে পারেন না।" তিনি আরো বলেন, "উচ্চ সাহস ও ধৈর্য্য থেকেই কথাবার্তায় সংযম ও সহনশীলতার সঞ্চার হয়। এবং কথার মান উন্নত হয়।" আসুন আমাদের সন্তানদেরকে সেভাবে গড়ে তুলি যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) উচ্চাঙ্গীন ব্যবহারিক চরিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বিজয়ের জন্য নিজ সন্তানদের সামনে ধৈর্য্যের এক উত্তম নমুনা পেশ করেছিলেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেন, "বস্তুত ভাল ও মন্দ সমান নয়। অতএব তুমি তা দ্বারা মন্দকে প্রতিহত কর, যা সর্বোত্তম। ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে ও তোমার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হয়ে যাবে। কিন্তু এর অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকে যারা ধৈর্য্য ধারণ করে এবং এর অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকে যারা মহা সৌভাগ্যশালী" (৪১ঃ৩৫-৩৬)।

বর্তমান আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উপর এক দুর্যোগময় সময় অতিবাহিত হচ্ছে, আমরা যারা আহমদী-তবলীগ করার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কথাবার্তার মধ্যে কোন রকমের অভদ্রতা ও অসম্মান প্রকাশ পাচ্ছে কিনা? কেননা আল্লাহ্তাআলা যাদেরকে পার্থিব সম্মান দিয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই সম্মান করে কথা বলা উচিত।

আমাদের নবী করীম (সঃ) ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে যে ধরনের অত্যাচার ও কঠোরতা সহ্য করেছেন পৃথিবীতে এমন নজীরবিহীন দৃশ্য পৃথিবীর মানুষ আর কোন সময় দেখে নাই। আমরা যেন তবলীগ করতে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে এগুলো সহ্য করি। এবং রসূল করীম (সঃ)-এর সেই নমুনা যেন পেশ করি যা তায়েফের ময়দানে পেশ করেছিলেন। হে বন্ধুগণ! আজও মক্কার সেই দুর্বল মুসলমানদের উপর মুশরেকদের অত্যাচারের দৃশ্য আমাদের সামনে ভেসে উঠে। তারা খোদাতাআলার তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক নমুনা পেশ করে গেছেন। আমরা জানি সেই বেলাল (রাঃ) যিনি রসূল করীম (সঃ) এর নির্দেশে ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিনের দায়িত্ব করেছিলেন। তাঁর পুরো নাম ছিল বিলাল ইবনে রাবা (রাঃ)। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ও পবিত্র আত্মার মুসলমান ছিলেন। তিনি ঐক সময় উমাইয়া ইবনে খালক এর কৃতদাস ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে দিনে দুপুরে তাঁকে মক্কার মরুভূমিতে নিয়ে চিত করে শুয়ে দিত। অতঃপর তাঁর বুকের উপরে একটা প্রকান্ড পাথর চাপা দিয়ে রাখার নির্দেশ দিত। তারপর তাঁকে বলত মুহাম্মদকে অস্বীকার করে নাও ও উজ্জার পূজা কর। নচেৎ তোমাকে এভাবেই রাখা হবে। এত কঠিন যন্ত্রণা ভোগের মুহূর্তেও তিনি বলতেন, আহাদ! আহাদ! অর্থাৎ আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ এক।

যখন তিনি আহাদ আহাদ বলতেন তখন বিলালের উপর অত্যাচার আরো বেড়ে যেত। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) বিলালের উপর অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে উমাইয়া ইবনে খালক হতে মুক্ত করে আনলেন। হযরত বিলাল (রাঃ) ধৈর্য্য ও সাহসিকতার যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন তা উম্মতে মোহাম্মাদীয়ার জন্য শিক্ষণীয় আদর্শ হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদেরকে সেই

দুনিয়া তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না যদি আকাশের সাথে তোমাদের দৃঢ় সম্পর্ক থাকে। তোমাদের নিজেদের ক্ষতি নিজেদের হাতেই হবে, শত্রুর হাতে নয়। তোমাদের পার্থিব সম্মান যদি বিনষ্ট হয়ে যায়- তাহলে খোদা তোমাদেরকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দান করবেন।

অনুকরণীয় আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের মাঝে সেই উত্তম নমুনা পেশ করতে হবে, তবেই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাকওয়া। যেই কর্মে এই মূল ধ্বংস হয়না সেই কর্ম কখনও ধ্বংস হবে না। ইহা নিশ্চিত যে তোমাদেরকে নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের পরীক্ষা দিতে হবে। যেরূপ পূর্ববর্তী মোমেনগণের পরীক্ষা হয়েছিল। অতএব সাবধান এরূপ যেন না হয় যে তোমরা হোচট খাও। দুনিয়া তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না যদি আকাশের সাথে তোমাদের দৃঢ় সম্পর্ক থাকে। তোমাদের নিজেদের ক্ষতি নিজেদের হাতেই হবে, শত্রুর হাতে নয়। তোমাদের পার্থিব সম্মান যদি বিনষ্ট হয়ে যায়- তাহলে খোদা তোমাদেরকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দান করবেন। অতএব, তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করো না। অবশ্যই তোমাদিগকে দুঃখ দেয়া হবে। এবং অনেক আশা হতে তোমাদের নিরাশ করা হবে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় তোমরা দুঃখিত হয়ো না। কেননা তোমাদের খোদা তোমাদের পরীক্ষা করে দেখতে চান যে তোমরা তাঁর পথে অবিচল রয়েছে কিনা। যদি তোমরা চাও যে আকাশের ফেরেশ্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তা হলে মার খেয়েও তোমরা সন্তুষ্ট থাকবে। গালি শুনেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং বিফলতা দেখেও আল্লাহ্র সাথে তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। তোমরা আল্লাহ্তাআলার শেষ জামাত। সুতরাং তোমরা সেই নেক আমল প্রদর্শন কর যার উৎকর্ষতা চরম পর্যায়ে পৌছেছে" (কিশ্তিয়ে নূহ ঃ ২৭)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর এই নসিহতের উপর আমরা যেন কায়েম থাকি। খোদাতাআলার বাণী প্রচার করতেই হবে। এই

মনোবল নিয়ে তবলীগের ময়দানে আমরা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ি। তাতে যতই দুঃখ-যন্ত্রণা আসুক না কেন। হে বন্ধুগণ! আমাদের আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। তিনি কি খোদাতাআলার বাণী প্রচারে কখনও শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন? তিনি কি নামাযে সেজদারত অবস্থায় মক্কার সেই মুশরেকদের নির্যাতন সহ্য করেন নাই? তাঁর পিঠের উপর কি মুশরেকরা উটের নাড়ি-ভুড়ি এবং সেজদা অবস্থায় গলায় ফাঁস দেয়নি? তিনি কি রাস্তায় হাঁটার সময় কাফেরদের দেয়া ধুলো-বালির মাথার উপর করণ করে নেয়নি? তিনি কি খোদাতাআলার বাণী প্রচারে ক্ষুধার্ত জীবন যাপন করেননি? ক্ষুধার তাড়নায় নিজেদের পেটের মধ্যে পাথর বেঁধে রেখেছিল? তিনি কি তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত হননি? সেদিন খোদার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। এই বলেছিল হে মুহাম্মদ (সঃ) মানুষ ইমান আনে না বলে তুমি তোমার জীবনকে ধ্বংস করে দিবে? আজ পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে সেই কুরবানির কথা। হে বন্ধুগণ! আসুন আমরাও আজ সেই কুরবানির মাধ্যমে নতুন এক ইতিহাসের সূচনা করি এবং বিশ্বকে এক নতুন পৃথিবী উপহার দেই। এবং এই কথা বলে যাই– তোমরা সাক্ষী থাক হে পৃথিবীর মানুষ! মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের কুরবানি বৃথা যায়নি। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তার সাহাবাদের কুরবানি ইসলামের সকল যুগের জন্য এক উৎকৃষ্ট ও অনুসরণযোগ্য মহান আদর্শ। তারই অনুসরণে তাঁর এক আধ্যাত্মিক বিকাশ হল এই যুগের মসীহ্ ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ। যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কুরবানির দ্বিতীয় বিকাশ দেখতে হয়– যেভাবে হযরত খাব্বাব (রাঃ) কুরবানির এক নমুনা পেশ করেছিলেন। তাহলে দেখ জামাতে আহমদীয়াকে।

সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ (রাঃ)-এর কুরবানি কি রসূল করীম (সঃ)-এর সেই-সাহাবাদের কুরবানির দৃশ্য কাবুলের মাটিতে সংঘটিত করে নাই? হে বন্ধুগণ! সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেবের কুরবানির কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে। তাঁকে বলা হয়েছিল মির্যা সাহেবকে অস্বীকার করেন আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে। সাহেবযাদা কিছুতেই তা স্বীকার করলেন না বরং আমীর নসরুল্লাহ্ খানও উলামাদের উপস্থিতিতে অতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন যে, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্র বিরুদ্ধে কখনও একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবেন না। বরং এরূপ করার চেয়ে তার মৃত্যুই শ্রেয়। এমন কি প্রস্তর নিক্ষেপের কিছুক্ষণ পূর্বের মুহূর্ত পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছিল প্রতিশ্রুত মসীহ্কে অস্বীকার করেন আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে। কিন্তু তিনি খোদা এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর সম্মানের ভয়ে দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এবং উচ্চ স্বরে তিনি এই ঘোষণা দেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তার প্রেরিত রসূল। হে বন্ধুগণ! সাহেবজাদার এই উচ্চস্বরের ঘোষণা এবং হযরত সাহেবযাদা সাহেবের নির্মম হত্যা কান্ডের ২৪ ঘন্টাও অতিক্রান্ত হলনা কাবুলের আকাশ আল্লাহ্তাআলার গযবে ফেরেশ্তাদের দ্বারা প্রকম্পিত হয়ে উঠল। এবং কাবুলে কলেরার প্লাবন দ্বার খুলে দিল। আর শিয়াল কুকুর শকুন রাস্তায় মৃত মানুষ ভক্ষণ করতে লাগল। অবশেষে কাবুলের এই নির্মম হত্যাকান্ডের ফলে ৮০ হাজারেরও অধিক মানুষের মৃত্যু ঘটল। পৃথিবীর মানব ইতিহাসে কলেরার এমন ভয়াবহ নজীর বিহীন ঘটনা আর কখনও সংঘঠিত হয়নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "খোদাতাআলা আমাকে বারবার সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আমাকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিবেন আর মানবের অন্তরে আমার ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং আমার সিলসিলাহ্ ও জামাতকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিবেন। আর এই জামাত প্রবল বেগে বৃদ্ধি লাভ করবে এবং ফুলে ফলে সুশোভিত হবে, এমনকি বিশ্বকে ঘিরে ফেলবে। অনেক বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হবে এবং পরীক্ষা আসবে কিন্তু খোদা সব দূরীভূত করে দিবেন। এবং নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।" (রূহানী খাযায়েন ২০ খন্ড, পৃষ্ঠা-৪০৯-৪১০)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই উদ্ধৃতির মধ্যে আমাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যে, এই ময়দানে আমরাই বিজয় লাভ করব। আর পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যা আমাদেরকে পরাজিত করতে পারে। সুতরাং আমরা যেন এসব বিরোধিতায় বিচলিত না হই। সেই বিরোধিতা খোদাতাআলার তরফ থেকে আমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আমাদেরকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে এবং খোদাতাআলার প্রতিশ্রুতির উপর পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) বাংলাদেশের আহমদী ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ঐশী জামাতের উপরে বিপদ-আপদ ও দুঃখ কষ্টের পালাও আসতে থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখুন আল্লাহ্তাআলা নিজ অনুগ্রহে এই সব বিপদ আপদকে দূর করে থাকেন। আর নেক ও নিষ্ঠাবানদেরকে সব সময় হেফাযত এবং সাহায্য করে থাকেন। যখন থেকে নবী (সঃ) দের আগমনের ধারা শুরু হয়েছে কখনও খোদার নবী ও তাদের মান্যকারীগণ বিফল হননি। তারা সবসময় বিজয়ী হয়েছেন এবং সফলতা তাদের পদচুম্বন করেছে। শত্রুরা নিজেদের ধারণাবশত মনে করে থাকে যে, তারা তাদের বিরোধিতাপূর্ণ চক্রান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টায় ঐশী সিলসিলাহ্কে নির্মূল করে দিবে। কিন্তু তাদেরকেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়ে থাকে।" তিনি বলেন- "জামাতে আহমদীয়া একটি ঐশী জামাত এই জামাতের সাথে খোদার অঙ্গীকার তিনি একে পরিশেষে অবশ্যই বিজয় দান করবেন। আর শত্রুরা ব্যর্থতার মুখ দেখবে। আপনারা ধৈর্য্যের পন্থা অবলম্বন করুন। ধৈর্য্যের অস্ত্র এমনই– কামান দিয়েও সে কাজ হয় না, যা ধৈর্যের দিয়ে হয়ে থাকে। ধৈর্য্যই মানবের অন্তরগুলোকে জয় করে থাকে। আপনারা দোয়ার জোর দিন এবং খোদাতাআলার দোড়গোড়ায় ঝুঁকে থাকুন। নামাযে পাবন্দ বা নিয়মিত নামায আদায়কারী হয়ে যান। বিনয় ও নম্রতার জীবন-যাপন করতে থাকুন। আপনারা খোদার বিনীত বান্দায় এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে বিচরণকারী হোন; যেন আপনাদের পরিবার পরিজনসহ মুক্তি পেয়ে যান।" হুযূর আমাদেরকে এই অভয় বাণী দিচ্ছেন "আমার দোয়া ও ভালবাসা আমাদের সাথে রয়েছে এবং আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হোন, আমীন।"

(১লা জানুয়ারী ২০০৪) ফ্যাক্স মারফত প্রাপ্ত

আল্লাহ্ করুন হুযূর (আইঃ)-এর এই বাণীকে আমরা যেন আমাদের হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে যাই।

হাশেম উল্লাহ্ সিকদার

মহানবী (সঃ)-এর ভেষজ চিকিৎসা

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

প্রাচীনকালের মনীষীগণ বনৌষধি ও দ্রব্যের গুণাবলী সম্বন্ধে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কী কী দ্রব্য ভক্ষণ করলে স্বাস্থ্যের উপর তা কী কী ফল প্রদান করে সে সম্পর্কে তাঁরা মানব সমাজকে উপদেশ দিতেন। নবী করীম (সঃ) এর হাদিসের মধ্যেও স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নানা উপদেশ রয়েছে। এই উপদেশগুলিই পরবর্তীকালে মুসলিম জগতে 'তিব্বুন নবী' বা 'নবীর চিকিৎসা' নামে প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে। রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে পবিত্র হাদিসসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মহানবী (সঃ) ওষুধ হিসাবে নিম্নলিখিত ঔষধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

মেথি (Melitotus indica)

মথি ঃ মেথি ব্যবহার করলে অনেক রোগ আরোগ্য হয় বলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলে গেছেন। পরবর্তী কালে গবেষণা করে দেখা গেছে যে, মেথিক্রাশ বা গুঁড়ো নিয়মিত খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। মেথি স্নিগ্ধপাচক ও বলকারক। অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বাত, অরুচি, গা-হাত-পা কামড়ানি, জ্বালাপোড়া, রক্তচাপ, বায়ুরোগ, বুক ধরফড়ানি, মাথাঘোরা, গেঁটে বাত, কোষ্ঠকাঠিন্য ও ঘন ঘন প্রস্রাবে মেথিক্রাশ বিশেষ উপকারী।

গম (Wheat)

রসূলে করীম (সঃ) বাড়ীতে কারো জ্বর হলে গম দ্বারা ঝোল বানিয়ে পান করাতেন। তিনি বলতেন, এই বস্তুটি মনকে সতেজ করে, হৃদয়কে শক্তিশালী করে এবং রোগীর মন থেকে কষ্ট দূর করে। গমের রুটি ছিল তাঁর খুব প্রিয়। পোড়া-ঘা, বিবিধ চুলকানি ও দাহযুক্ত ফোলায় গমের আটার বাহ্য প্রয়োগ আছে। ডায়াবেটিস রোগীর আহার্য হিসাবে গমজাত দ্রব্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যকৃৎ সমস্যায়, আমবাতে, অত্যাধিক ক্লান্তিতে, কৃশতায়, খোস পাঁচড়ায়, জ্বালাবাতে, মচকে যাওয়ায় গম খুব উপকারী।

কুল (Plum)

কুল সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) বলেন, হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে আগমনের পর সর্বপ্রথম এই কুল খেয়েছিলেন। কুল আহার্য ও পথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যে সকল রোগে কুল উপকারী। ঃ ১) অতিসার, ২) পেটে বায়ু ও অরুচি, ৩) হৃদরোগ, ৪) খাই খাই রোগ, ৫) কোষ্ঠরোগ, ৬) বসন্ত রোগ, ৭) রক্ত আমাশয়, ৮) রক্ত পিত্ত, ৯) মেদ রোগ, ১০) স্বরভঙ্গ, ১১) মাথার যন্ত্রণা, ১২) প্লীহা রোগ, ১৩) অর্শের যন্ত্রণা, ১৪) বিষাক্ত কীট দংশন, ১৫) ফোঁড়া ও ১৬) শয্যাক্ষত।

লাউ (Gourd)

লাউ সম্পর্কে মুসলিম ও বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূর (সঃ) হযরত আয়েশাকে বলেছেন, তরকারির সাথে অধিক পরিমাণে লাউ রান্না কর। কারণ এতে বিষন্ন মনে ও দেহে শক্তি আসে। পরবর্তীকালে লাউ নিয়ে গবেষণা করে জানা যায় পিত্তশ্লেষ্মাজনিত জ্বরে, অম্লরোগে, দাহে, অর্শবিকারে, পায়োরিয়ায়, দূষিত ক্ষতে, মেচেতায়, ছুলিতে, ছানিতে ও শ্বেতরোগে লাউ অত্যন্ত উপকারী। এর ঔষধিগুণ বিচার করে দেশীয় ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় লাউ মোরব্বা রূপে, শরবত রূপে ও সুপথ্যরূপে ব্যবহার করা হয়।

কালিজিরা (Cummin)

হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'কালিজিরা একমাত্র মৃত্যু ছাড়া সব রোগের মহৌষধ।' পরবর্তীতে গবেষণা থেকে জানা যায় উদরী ও ফুসফুসজনিত রোগে, ক্রিমির উপদ্রব নিবারণে, মাথার যন্ত্রণায়, গলা ফোলায়, চর্মরোগে, কাশি ও জন্ডিসে, অর্শরোগে কালিজিরা হিতকর।

রসূন (Garlie)

রসুনে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ডি, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস, আয়রন ও সোডিয়াম আছে। বনৌষধির মধ্যে রোগ প্রতিকারে রসুনের স্থান প্রথম। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে রসুন ব্যবহৃত হয় ঃ ১) হৃদরোগ বা হার্ট এ্যাটাক, ২) উচ্চ রক্ত চাপ, কাশি, হাঁপানি ও ব্রংকাইটিস, ৪) ডাইরিয়া, ডিসেন্ট্রি ও অন্ত্রের প্রদাহ, ৫) অস্থি চ্যুতি, ৬) অস্থিভগ্ন, ৭) অস্থি সম্বন্ধীয় রোগ, ৮) কুষ্ঠরোগ, ৯) কৃমি রোগ, ১০) গুল্ম রোগ, ১১) চর্মরোগ, ১২) নেত্ররোগ ও রাতকানা রোগ, ১৩) জীর্ণ জ্বর ও কালাজ্বর, ১৪) ডিস্‌মোনিয়া, ১৫) রিউমেটিজম এবং পিঠ ব্যথা, ১৬) মুখ, জিহ্বা ও ঠোঁটের ঘা, ১৭) পায়োরিয়া, ১৮) দেহের মেদ ও ভুঁড়ির চর্বি বৃদ্ধি রোধে, ১৯) রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধিতে, ২০) আহারে দূষিত দ্রব্য (Toxic) বিনষ্ট করে।

খেজুর (Date)

রাসূলে করীম (সঃ) খেজুর সম্পর্কে বলেন, শুকনো খেজুর বেহেস্ত থেকে আসে এবং তা' বিষের প্রতিষেধক গুণাবলী সম্পন্ন উত্তম সুস্বাদু ফল। কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ পাক খেজুরের উপকারিতা সম্পর্কে বলেন, 'এবং খেজুর ও আঙ্গুর ফল হতেও তোমরা তৈরী কর পানীয় ও উত্তম আহার, নিশ্চয়ই এটাতে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (আয়াত ৬, ৭ সূরা নাহল)

বন্ধুরা, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সেই প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে বিভিন্ন দ্রব্য সম্পর্কে যা' বলে গিয়েছেন তা' আমরা আজ গবেষণার মাধ্যমে সত্য বলে জানতে পেরেছি। আসলে এই পৃথিবীতে যা' কিছু আছে সবই মানুষের উপকারের জন্যে। আশা করি আমরা এই খাদ্যদ্রব্যগুলোর গুণ সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারবো এবং আমাদের জীবনে তার সঠিক প্রয়োগে সচেষ্ট হবো। আমরা তাইতো চাই। চাই সুস্থ সবল মানুষ। কেউ যেন রোগে আক্রান্ত না হতে পারে।

সংগ্রহ - মারিয়া হোসেন

এম.টি.এ. ডাইজেস্ট

(১লা আগস্ট - ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮)

এ সময়কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার শেষ দুইদিন। তবে যেহেতু এটি অনেকেই এম. টি. এ.-তে দেখেছেন, আর তা ছাড়াও পাক্ষিক আহমদী-তে এর উপর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাই অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কিছু অনুষ্ঠানের বিবরণ সন্নিবেশিত হল।

জার্মানীর জলসা

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানীর সালানা জলসা আগস্টের ২১-২৩ তারিখে মানহাইম শহরের নিকট মাই মার্কেটে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৩ হাজারের অধিক ব্যক্তি উপস্থিত হন। উল্লেখ্য যে, এশিয়া ও আফ্রিকার বাইরে এটিই বৃহত্তম জলসা। জলসার প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান পরবর্তী দিনে সম্প্রচার করা হয়।

এবারের জলসায় হুযূর (আইঃ)-এর গত বছরের নির্দেশনা অনুযায়ী বসনীয়, আলবেনীয় ও আরবদের জন্য পৃথক তাবুতে পৃথক পৃথক জলসার ব্যবস্থা করা হয়। হুযূর আকদস (আইঃ)-এর ভাষণের সময় সবগুলো জলসাগাহ সংযুক্ত হয়। নবাগতদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। এক জলসার মধ্যে যেন কয়েকটি জলসা একযোগে চলছিল। ৮টি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল। প্রায় তিন লক্ষ রুটি এ জলসা উপলক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়। জলসার একটি অনন্য আকর্ষণ ছিল হুযূর আকদস (আইঃ)-এর সামনে দিয়ে প্রায় ১৩০০ ওয়াকেফীনে নও-এর মার্চ পাস্ট। মনে হচ্ছিল যেন, লাইন কখনো শেষ হবে না।

জুমুআর খুৎবার মধ্য দিয়ে জলসার উদ্বোধন হয়। ঐদিনই উর্দূতে দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর সভা হয়। দ্বিতীয় দিনে হুযূর (আইঃ) মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন এবং পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন তাবুতে প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত হন। শেষের দিনে কিছু ছোট অনুষ্ঠান ছাড়া হুযূর (আইঃ)-এর সমাপনী ভাষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জলসার বিভিন্ন ভাষণে হুযূর (আইঃ) জার্মানী জামাতের খেদমতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আজ প্রায় ৩০,০০০ আহমদী জার্মানীতে কুরবানী করে চলেছে। তিনি বলেন যে, এমন দিন যায় না যেদিন জার্মানী জামাতের নিষ্ঠাপূর্ণ কুরবানী স্মরণ করে তিনি দোয়া না করেন।

জার্মান জাতির সত্যের প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠার উল্লেখ করে হুযূর (আইঃ) বলেন, আজ বিশ্বকে ফেরাতে হলে জার্মান জাতিকে আগে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। যদি এরা শুধরে যায় তবে পুরো পাশ্চাত্য সমাজের সংশোধনের কিছু না কিছু আশা থাকে।

হজ্জ ও জলসার পৃথক তাৎপর্য

'লেকা মা' আল আরব' – অনুষ্ঠানের একটি পর্বে "আহমদীরা জলসায় যাওয়াকে হজ্জের তুল্য বলে মনে করে" – এ অভিযোগের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, হজ্জ স্থায়ীভাবে মক্কা ও তদ্‌সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত বিশেষ ইবাদত। এটি অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে পারে না। তবে ইসলামের কার্যকর কেন্দ্র নবী বা তাঁর প্রতিনিধির সাথে সাথে চলতে থাকে। যখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মদীনাতে ছিলেন তখন হজ্জের কেন্দ্র মক্কা হলেও ইসলামের কার্যকর কেন্দ্র ছিল মদীনা। আর দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ইসলামের শিক্ষা ও চর্চার জন্য মদীনাতে সমবেত হতেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ লোকে দুনিয়াবী কারণে পাশ্চাত্য সফরে গেলে, এমনকি হজ্জ না করে সেখানে গেলেও, কোন আপত্তি করে না। অথচ ধর্মের জন্য যুগ-ইমামের সাথে মিলিত হতে গেলে আপত্তি উঠে। তবে সেই সাথে মনে রাখা দরকার, আহমদীরা অবশ্যই এ বিশ্বাস রাখে যে, যদি কেউ ৫০ বারও জলসায় যোগদান করেন, তথাপি হজ্জের দায়িত্ব তার মাথার উপর ঝুলে থাকে। আর শর্তাবলী পূর্ণ হলে এ ফরয তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে।

আয়াতে সিজদা-এর ক্ষেত্রে করণীয়

পূর্বে হুযূর (আইঃ) এম.টি.এ-তে কোন অনুষ্ঠান চলাকালীন আয়াতে সিজদা আসলে সকলকে নিয়ে সিজদা দিতেন। কিন্তু সম্প্রতি একটি তরজমাতুল কুরআন ক্লাসে হুযূর আকদস (আইঃ) বলেন যে, গবেষণায় তিনি এমন বেশ কিছু ঘটনা পেয়েছেন যেখানে জনসমক্ষে কোন আয়াতে সিজদা পাঠ করা হয়েছে, অথচ সকলে মিলে সিজদা দেয়া সাব্যস্ত নয়। তাই এখন থেকে দরস, প্রশ্নোত্তর বা এ জাতীয় ক্ষেত্রে এরূপ আয়াতের সম্মুখীন হলে ইশারায় কেবল সিজদা দেয়া হবে আর পরবর্তীতে নিজ সুবিধামত পূর্ণাঙ্গ সিজদা দেয়া যেতে পারে।

'বারাহীনে আহমদীয়া' অনুবাদের দুষ্করতা

বারাহীনে আহমদীয়ার অনুবাদের উপর এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) 'লেকা মা'আল আরব' অনুষ্ঠানে বলেন, এটি অত্যন্ত দুষ্কর। একবার স্যার চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রাঃ)-এর অনুবাদের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন যে, অন্য কোন বইয়ের অনুবাদ এত কঠিন মনে হয় নি। একেকটি বাক্য এমন গভীর যে, মন ভাবের জগতে হারিয়ে যায়, আর একেকটা বাক্য অনুবাদ করতে মনে হয় যেন কয়েক পৃষ্ঠা লাগবে।

হুযূর (আইঃ) বলেন,আমি নিজে তাঁর অনুবাদ দেখেছি আর এতে বেশ কিছু কমতি পেয়েছি। বস্তুতঃ চৌধুরী সাহেবের ইংরেজী জ্ঞান যতটা ছিল উর্দূর দখল তত গভীর ছিল না। বর্তমানে মনে হয় কেবল ব্যাখ্যা লেখা যেতে পারে, বা নিজ ভাষায় বিষয়-বস্তু বর্ণনা করা যেতে পারে। তবে অনুবাদের জন্য বোধ হয় কয়েক পুরুষ অপেক্ষা করতে হবে। এই অবস্থায় একজন বলেন, তাহলে কি বলা যাবে এর অনুবাদের জন্য যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন তিনি এখনো জন্মান নি । হুযূর (আইঃ) বলেন, হ্যাঁ, বলা যেতে পারে।

স্পেনে আহমদীয়তের ইতিহাসে এদেশের সাংবাদিকদের ভূমিকা

আহমদীয়তের ইতিহাস-এর উপর ধারাবাহিক কুইজ প্রতিযোগিতার এক পর্বে স্পেনে আহমদীয়তের ইতিহাসের উপর আলোচনার এক পর্যায়ে বলা হয় যে, এক সময় [সাল্‌টা ১৯৫৬ বা ১৯৬৩ যতদূর মনে পড়ছে – সংকলক] স্পেনে তারা বিদেশী ভিন্নধর্মী প্রচারকদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সংবাদ ভারতবর্ষে পৌছলে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এক প্রতাপান্বিত খুতবা দেন। এতে মুসলমান দেশগুলোকে-এর প্রতিবাদের জন্য আহ্বান করা হয়। সেই সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের তিনটি পত্রিকা ইত্তেফাক, আজাদ ও দৈনিক মিল্লাত সম্পাদকীয় বা প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এগুলো জুন মাসের শেষ ১০ দিনে প্রকাশিত হয়। আহমদীয়তের ইতিহাসে এটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বয়াতের পর পরই বিয়ে সংক্রান্ত মন্তব্য

হুযূর (আইঃ)-কে 'লেকা মা'আল আরব'-এ প্রশ্ন করা হয়, কোন মেয়ে বয়াত করার পর যদি যার তবলীগে বয়াত করেছেন তাকে বিয়ে করতে চান তবে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে। হুযূর (আইঃ) উত্তরে বলেন, জামাতের পক্ষ থেকে বাধা নেই। তবে প্রশ্ন হ'ল এই যে, ছেলেটি কি দুনিয়াতে তবলীগ করার জন্য আর কাউকে পায় নি। খেয়াল করা দরকার কি উদ্দেশ্যে বয়াত করা হয়েছে? বয়াতের উদ্দেশ্যের মধ্যেই যদি সমস্যা থাকে তবে বিয়ে ও বয়াত দু'টোই যেন কমজোর হয়ে গেল।

মরিশাসে জলসা

এ জলসার সংবাদ সংকলক পূর্ণ শুনতে পায়নি। তবে এটুকু শোনা গেছে যে, আল্লাহ্‌র ফযলে সুন্দরভাবে জলসা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে এতে উপস্থিত ছিলেন।

সংকলক – আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক

সুন্দরবন হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের প্রবীন বুযূর্গ

শেখ জোনাব আলী সাহেব স্মরণে

বাংলাদেশের একপ্রান্তে ঐতিহ্যবাহী সুন্দরবনের গা ঘেঁষে প্রতিষ্ঠিত সুন্দরবন হাইস্কুল এর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারী বহুবিধ গুণ ও প্রতিভার অধিকারী এক নির্ভীক মহান ব্যক্তিত্ব শেখ জোনাব আলী (হেড মাস্টার) সাহেব গত ১১ই জানুয়ারী ২০০৫ ইং সন সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে নিজ বাস ভবনে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ছিল ৭৫ বৎসর (প্রায়)। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ভক্তির এক অসাধারণ গুণের অধিকারিনী ধার্মিক স্ত্রীসহ চার ছেলে দুই মেয়ে এবং ১৬ জন নাতি-নাতিনসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে উপস্থিতিদের কান্না কাটির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী আহমদী ও অ-আহমদী নির্বিশেষে যারা স্কুল মাঠে বা বাজারে উপস্থিত ছিলেন প্রায় সকলেই এসে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন, শেষ বারের মত তাঁকে দেখতে এবং মরহুমের লাশ দাফনে সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করার জন্য।

মরহুম ১৯৪৭ সালে কলিকাতা বোর্ড এর অধীনে ম্যাট্রিক পাশ করেন, ১৯৫০ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে আই. এ. পাশ করেন অতঃপর ১৯৫৩ সালে বি.এ. পাশ করার পর পরই তিনি সুন্দরবন হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। সেই সাথে তিনি নিজ পারিবারিক ঠিকানা আশাশুনি থানার রাজাপুর গ্রাম ছেড়ে সুন্দরবনের উক্ত এলাকার স্কুল সংলগ্ন ঠিকানায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫৬ সনে B.T (বর্তমানে বি এড) পাশ করেন এবং ১৯৫৬ সন হতে ১৯৯০ সন পর্যন্ত সুন্দরবন হাই স্কুলের এবং (কিছু দিনের জন্য) হরিনগর বাজারে অবস্থিত বনশ্রী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সনে সুন্দরবন এলাকায় জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি জামাতের জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। সুন্দরবন জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান সাহেবের ইন্তেকালের পর ১৯৮৭ সালে সুন্দরবন জামাতের এক সংকটমকয় মূহুর্তে তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি শিক্ষকতার চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অনেক বড় বড় সরকারী চাকুরীর সুযোগ পেয়েও তিনি সুন্দরবন এলাকার মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং তাদের অনুরোধে শিক্ষকতার এই সম্মানজনক পেশা ছেড়ে অন্য কোন চাকুরীতে যোগ দেন নাই। সুন্দরবন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ (সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-আহমদী সদস্য থাকা সত্ত্বেও) সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত উক্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত রেখে সম্মান প্রদর্শন করেন।

একজন শিক্ষানুরাগী হিসাবে তিনি সুন্দরবন এলাকায় শিক্ষার আলো জ্বালানোর ক্ষেত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন । তিনি ঐ অঞ্চলের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছে ছিলেন একান্ত আপন এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। আর যারা তাঁর ছাত্র ছিলনা এমন ছোট বয়সের সকলেই তাঁকে নানা বলেই আদর করে সম্বোধন করত। তিনি সব সময় এলাকার মানুষের তথা সমাজের উপকারের কথাই চিন্তা করতেন, এমনকি কোন কোন সময় তিনি নিজের ক্ষতি জেনেও অন্যের উপকারে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং মানুষকে সৎ উপদেশ দিতেন। তিনি একজন অসাধারণ গুণ সম্পন্ন সৎ মানুষ ছিলেন। সত্যের সমর্থনে তিনি ছিলেন একটি নির্ভীক ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর । বক্তা হিসাবেও তিনি ছিলেন খুবই মিষ্টভাষী ও জনপ্রিয় ।

শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন সকল ছাত্র ছাত্রীদের নিকট একজন আদর্শ ব্যক্তি। পড়ালেখায় ভাল মেধাবী ছাত্রদেরকে তিনি প্রতিভা বিকাশের সকল প্রকারের সুযোগ সুবিধা সহ উপায় উপকরণ সরবরাহ ও পরামর্শ দিতেন। কোন কোন সময় রাতের অন্ধকারে ছাত্র/ছাত্রীদের পড়ালেখার খোঁজ-খবর নিতে স্কুল বোডিং এর আশে পাশে এবং ছাত্রদের বাড়িতে বাড়িতে যেতেন এবং অভিভাবকদের পরামর্শ দিতেন। ব্যক্তিগত ছাত্র জীবনেও তিনি তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় রেখেছিলেন। ১৯৫০ সনে এইচ. এস. সি. তে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। দুনিয়াবী পড়ালেখার পাশাপাশি তিনি নিয়মিতভাবে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের পর্যালোচনা, গবেষণামূলক পড়ালেখা করতেন । তাঁরই অনেক ছাত্র ছাত্রী বর্তমানে দেশে বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীতে রত আছেন।

সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়েও তিনি খুব আমোদ-প্রমোদ খেলাধুলা করতেন । স্কুলে তিনি তাদের বহুবিধ প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন এবং স্কুলের দিগন্ত বিস্তীর্ণ মাঠে অনেক রকম খেলার ব্যবস্থা করতেন। বহুবিধ প্রতিভার এই ব্যক্তিত্ব মরহুম শেখ জোনাব আলী সাহেব শুধুমাত্র একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন না বরং তিনি নিজেও একজন ভাল খেলোয়ার ছিলেন এবং সুন্দর গানও গাইতে পারতেন। সবার সঙ্গে বন্ধুর মত মিশতেন আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে তিনি অসীম সাহস ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতেন। ফলে, তার কাছে কেউ অন্যায় আবদার নিয়ে কথা বলার সাহস পেত না।

তিনি পড়ালেখায় দুর্বল ছাত্রদেরকে যারা যে বিষয়ে পারদর্শী ছিল তাকে সেই বিষয়ে নিয়মিত অধ্যবসায় সহ চেষ্টা করতে পরামর্শ দিতেন। গায়কের সঙ্গে তিনি নিজেও গাইতেন এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে তিনি নিয়মিত খেলতেন। প্রত্যেক বিষয়ের প্রতিভাবানকে তাদের নিজ প্রতিভা বিকাশের পথে চেষ্টার ত্রুটি দেখলে বা অন্যায় ও অসদাচারণ করতে দেখলে সহজে ক্ষমা করতেন না । তার স্বভাব সুলভ বাঘের মত রুদ্র মূর্তি ধারণ করে গর্জে উঠতেন। পড়ালেখার সময় নষ্ট করে কোন ছাত্র অনর্থক তাঁর চোখের সামনে দিয়ে চলাফেরার সাহস পেত না। তিনি স্কুলের ছাত্রদেরকে বনভোজন করার ব্যবস্থা করতেন এমনকি অবসর গ্রহণের পরেও বহুবার গ্রামের সমবয়স্ক লোকদের সঙ্গে নিয়ে পরিবারসহ সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে নৌকাযোগে সমুদ্র এবং দুবলার চরে রাশ মেলা দেখতে যেতেন। তিনি একজন ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলের সাথে তিনি মিশতেন এবং সকলকে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করতেন। এখনও তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সেটা চালু আছে। তিনি কখনো বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। উন্নত মন মানসিকতা নিয়ে দরিদ্রের ন্যায় তিনি জীবন যাপন করতেন। তবে, তিনি ছিলেন খুব রসনা-বিলাসী অর্থাৎ ভাল খাওয়া পছন্দ করতেন, তেমনিভাবে তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ, বিদেশী মেহমানদের আপ্যায়ন এবং গরীব মিসকিনদের খাওয়ানোর ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন।

সুন্দরবনের মত এক নিভৃত এলাকায় আহমদীয়াতের মত এক অমূল্য সম্পদকে চিনতে, গ্রহণ করতে সর্বোপরি এটাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে যাদের অবদান অতুলনীয় মরহুম প্রেসিডেন্ট শামসুর রহমান সাহেবের সাথে মরহুম শেখ জোনাব আলী সাহেবের

নামও তাদের অন্তর্ভুক্ত। আহমদীয়াত গ্রহণের পর এর উপর এত বেশি পড়ালেখা/চর্চা তিনি করতেন যে কোন সাধারন আলেম ওলামাও তার সঙ্গে কোরআন হাদিসের তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে মোকাবেলায় সহসা এগিয়ে আসত না। সুন্দরবন জামাতের মসজিদে খোৎবা দেয়া, ধর্মীয় মিটিং ও জলসাসমূহে তিনি বিভিন্ন জঠিল বিষয়ের উপরে খুব সহজবোধ্য ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে এবং সুললিত কণ্ঠে কুরআন শরীফ তেলোয়াত করে শ্রোতাদেরকে বিষয়টা বুঝাতে পারতেন সর্বোপরি হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করতে পারতেন। তিনি আহমদীয়া জামাতের বিশ্বব্যাপী প্রচার মাধ্যম MTA International এর মাধ্যমে বক্তব্য ও কথোপকথনের মাধ্যমে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামকে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। অবসর জীবনের দিনগুলিতে তিনি সস্ত্রীক জামাতে আহমদীয়া তথা প্রকৃত ইসলামের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। স্কুল থেকে অবসর গ্রহণের পর কিছুদিন তিনি বকশীবাজার আহমদীয়া মুসলিম জামাত এর নিজস্ব প্রেসে পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার প্রকাশনের কাজ করতেন এবং কুরআন শরীফের বাংলা তরজমা প্রকাশের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সস্ত্রীক বাংলাদেশের সকল শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের প্রায় সব কয়টি জামাত পরিদর্শন করে তবলীগ বা ইসলাম প্রচারের কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বর্তমানে তার পরিবারের সদস্য সদস্যা অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতিন প্রায় সকলেই বিভিন্ন পেশায় ও পড়ালেখায় দেশে বিদেশে অবস্থান করছেন। আল্লাহতাআলার অশেষ রহমতে ও তাঁর দোয়ার ফসলস্বরূপ বর্তমানে প্রায় সকলেই আহমদীয়া জামাতের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। এক ছেলে ও তাঁর স্ত্রী এবং ৬ জন নাতি বিদেশে চাকুরী ও পড়ালেখা সহ পাশাপাশি আহমদীয়া জামাতের কাজ করছেন। তাঁর বংশধরের সদস্যদের মধ্যে বর্তমানে ৭ জন ওসীয়্যতকারী ২ জন নাতি ওয়াকফে নও এবং একজন মোবাশ্বের মুরুব্বী কোর্সে শেষ বর্ষে পড়ালেখা করছে।

তাঁর ইন্তেকালের পর জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এলাকার প্রায় সকলেই তাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে স্থানীয় সকল আহমদী সদস্য সদস্যাগণ ছাড়াও সাতক্ষীরা, কলারোয়া-আশাশুনি-কালিগঞ্জ, শ্যামনগর এলাকা থেকে মরহুমের অ - আহমদী আত্নীয় স্বজনের মধ্য হতে ভাতিজাগণ, শ্যালকগণ ও শালিকা, তাদের সন্তান ও আত্নীয়-স্বজনগণ উপস্থিত হন। সেই সাথে স্থানীয় বেশ কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য অআহমদী সমবয়স্ক ব্যাক্তিবর্গ এবং সহকর্মী শিকরাও মরহুমের দাফন কাফন ও দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত অআহমদী সমবয়স্ক একজন খাকসারকে বলেন "হেডমাস্টার সাহেব বয়সে আমাদের কারো সমবয়স্ক বা অনেকের চেয়ে বেশি বয়স্ক হয়েও আহমদী অ-আহমদী, শিক্ষিত অশিক্ষিত বা ধনী-গরীব সুলভ কোন পার্থক্য তিনি কাউকে করতেন না, সবার সাথে সমভাবে মিশতেন। আমাদের চলার পথে প্রতিনিয়তই আমরা তাঁর অসুস্থতার খোঁজ খবর নিতাম এবং তাঁর কাছ থেকে দোয়া নিতাম এবং তাঁর জন্য দোয়া করতাম। এই আদান প্রদানের মধ্যে প্রতেকেই আমরা অতীতের স্মৃতিচারণ করে হৃদয়ের একটা প্রশান্তি অনুভব করতাম, তাঁর এই ইন্তেকালে আমরা আমাদের একজন আপনজনের চিরবিদায়ের কষ্ট অনুভব করছি। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে আল্লাহতা'লা ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক প্রদান কর"ন। সেই সাথে দোয়া করি আল্লাহতালা তাঁর এই ত্যগের বিনিময়ে তাঁকে পরকালে অনুরূপ এক সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করুন-আমীন।"

মরহুম ছিলেন খুব মিশুক এবং রসিক এর প্রমাণ দিতে গিয়ে তাঁরই একজন প্রাক্তন ছাত্র যিনি এলাকার সন্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যাক্তি, প্রাক্তন মেম্বর জনাব আব্দুর রহিম সরদার বলেন, "ছাত্র জীবনে আমি খুব দুষ্টামি করতাম তবে স্যারকে আমি খুব ভালবাসতাম এবং স্যারও আমাকে খুব আদর করতেন। দেখা হলে দুষ্ট বলে সম্মোধন ও আমার কান ধরাটা ছিল স্যারের ও আমার মধ্যে ব্যক্তিগত ভালবাসার সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। এই মাত্র কয়েকদিন আগেও স্যার যখন বাজারে বসে চা খাচ্ছিলেন সেই সময় আমি স্যারকে সালাম দিয়ে কাছে বসি। স্যার অমনি এই বৃদ্ধ বয়সে স্কুল জীবনের স্বভাবসূলভ আচরণে আমার কান ধরে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন এই দুষ্ট এখনো কি সেই দুষ্টামি করিস?' আমি স্যারকে জড়ায়ে ধরে আন্তরিকভাবে তার ভালবাসাকে অনুভব করি এবং তাঁর জন্য দোয়া করি আর আমিও আমার জন্য দোয়া চাই।

তেমনিভাবে আরো একজন অ-আহমদী সন্মানিত ও এলাকার প্রভাবশালী সমাজসেবক প্রাক্তন ছাত্র নাম ফজলুল হক সরদার, তিনি খাকসারকে সম্বোধন করে বলেন, "তোমার কি মনে আছে, স্যার আমাকে কত ভাল বাসতেন? ছাত্র জীবনে আমি তেমন মেধাবী ছাত্র ছিলাম না তবে একজন ভাল ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে স্যার আমাকে, মেধাবী ছাত্রদের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন এবং আদর করতেন। পড়ালেখার কারণে স্যারের কাছ থেকে তেমন কোন কটুকথা শুনিনি যতনা খেলার মাঠে গোল করতে না পারলে বা ভাল না খেলতে পারলে বকুনী শুনেছি। স্যারের এই মৃত্যুর সংবাদ শুনে তাই ছুটে এলাম তাঁকে একবার শেষ নজর দেখার জন্য এবং দোয়া করতে।" উল্লেখ্য যে, শ্রদ্ধেয় ফুটবল খেলোয়াড় ফজলু ভাইয়ের সময়ে সুন্দরবন হাইস্কুল ইন্টার স্কুল স্পোর্টস ফুটবল খেলায় অনেক সুনাম অর্জন করেছিল।"

তেমনিভাবে,তাঁর প্রতি ভালবাসার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন একজন প্রাক্তন মেধাবী ছাত্র বর্তমান সুন্দরবন হাই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক জনাব আজিজার রহমান সাহেব। তিনি বলেন "বিগত স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে এলাকার সকল বৃদ্ধদের নিয়ে এক দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি আমার শ্রদ্ধেয় স্যারকে হুইল চেয়ারে বসায়ে দৌড়ে অংশ গ্রহণ করাই এতে সবাই আমরা দারুণভাবে আনন্দ উপভোগ করি। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী হিসাবে তাঁকে পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরষ্কার দিয়ে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করি। তাঁকে ছাড়া আমরা স্কুলে কখনো কোন অনুষ্ঠান করেছি বলে মনে পড়ে না এবং সকল সময় সম্মানিত আসনটা তাঁর জন্য আমরণ নির্দ্ধারিত ছিল। আমরা তাঁর পরিবারের সদস্যদের সান্তনা দিতে এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করি।" তেমনিভাবে আরো অনেক অ-আহমদী হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিরা এসেছিলেন তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ও দোয়া করতে।

মরহুমের দাফন ও জানাযা নামাযের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিলেন সুন্দরবন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মোহতরম আমীর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ সরদার। স্বামী বিয়োগের শোকে মরহুমের স্ত্রী কিছুক্ষণ পর পর বার বারই মূর্ছা যাচ্ছিলেন ফলে শোক সন্তপ্ত পরিবারের অন্যান্যরা মুহুর্মুহ আর্তনাদে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিলেন। এ অবস্থায় সকলকে সান্তনা দিতে বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন সুন্দরবন হাইস্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক জনাব এস. এম. আবু কওছার সাহেব।

জনাব শেখ জোনাব আলী সাহেবের ইন্তেকালের খবর পেয়ে ঢাকা থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত,বাংলাদেশের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ততক্ষণাৎ তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে জনাব মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেবকে প্রেরণ করেন। তিনি মরহুমের জানাযার নামাযের ইমামতি করেন এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন সেই সাথে শোক সন্তপ্ত পরিবারকে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে সান্তনার বার্তা পৌঁছান। ১২ই জানুয়ারী ২০০৫ বাদ যোহর মরহুমের নিজ বাসভবনে তার জানাযা ও দাফনের কাজ সম্পন্ন হয়। এতে অনেক আহমদী সহ গয়ের আহমদী নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদে বাদ জুম্মা মরহুমের গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

এই আদর্শবান ব্যক্তির ইন্তেকালে এলাকায় তথা আহমদীয়া জামাতে এক অপুরণীয় শুন্যতা সৃষ্টি হল। সেই সাথে আত্নীয়-স্বজন এবং সন্তান সন্ততিগণ হল আদর্শবান বন্ধু ও পিতৃহারা। সকলের নিকট এই সমস্ত বন্ধু ও পিতৃহারাদের হৃদয়ের সান্তনা লাভের জন্য দোয়ার দরখাস্ত রইল, যেন আমাদেরকে আল্লাহতা'লা তাঁর অপার অনুগ্রহে মরহুমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ ও দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত থেকে তাঁর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করতে সহায় হন। সর্বোপরি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আন্তরিক দোয়ার দরখাস্ত রইল। যেন আল্লাহতা'লা তাঁকে পরকালের জীবনে বেহেস্তের এক সুউচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে সমাসীন করেন, আমীন।

মোহাম্মদ আব্দুল আজীজ
সেক্রেটারী ফাইন্যান্স
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) এর কতিপয় বিশেষ মুহূর্তের ছবি

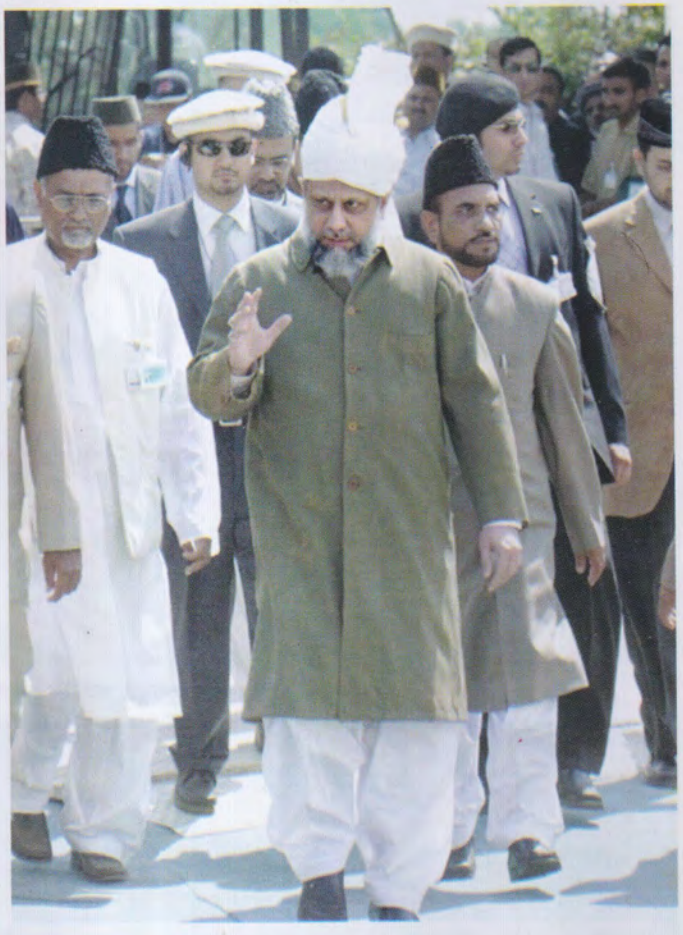

The AHMADI Bulletin Jan.31- Feb.15, 2005
(Published for Talim and Tarbiyyat for the Members of Ahmadiyya Muslim Jamaat)

আফ্রিকায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)

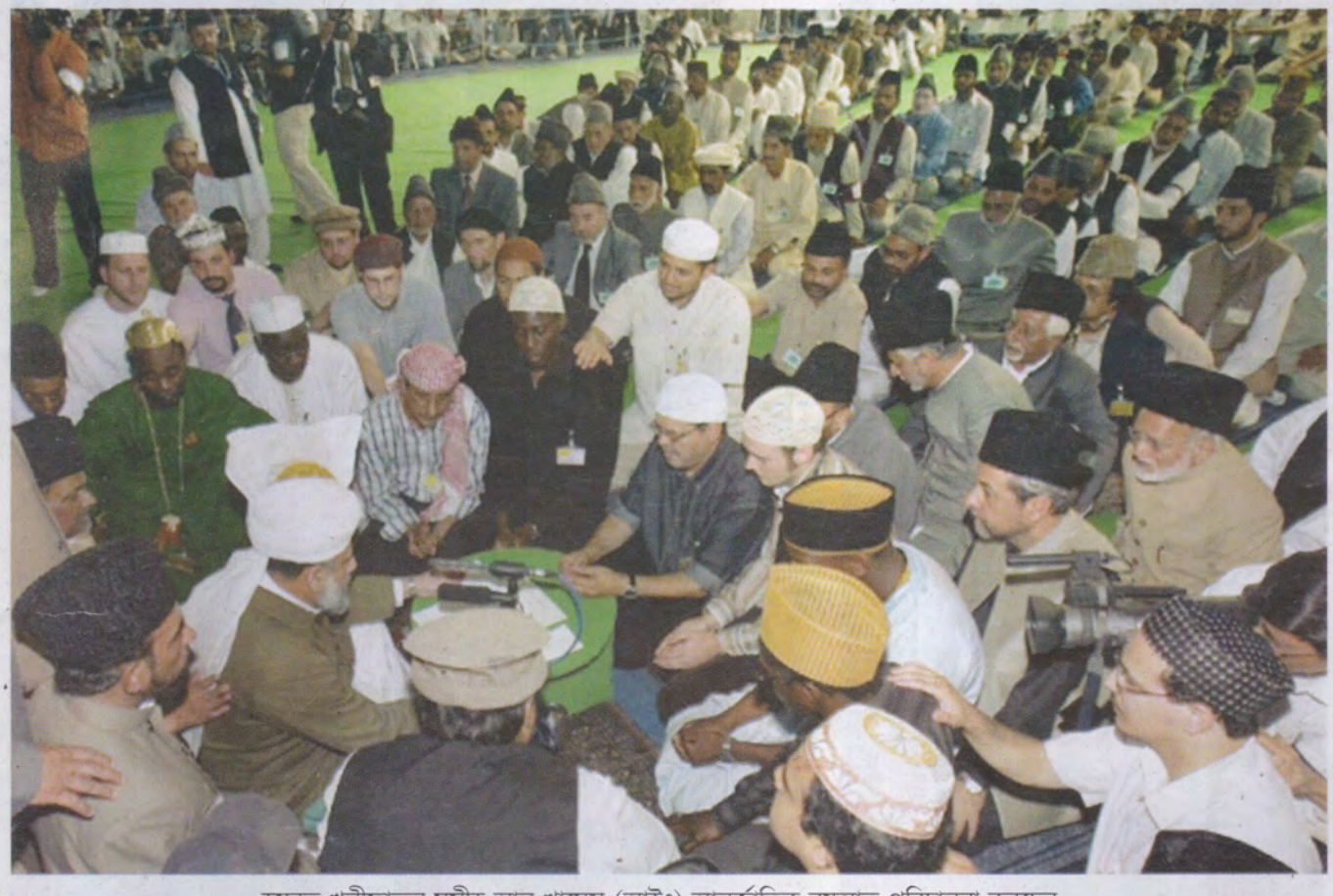

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) আন্তর্জাতিক বয়আত পরিচালনা করছেন

সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ মাহবুব হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশাআত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর পক্ষে
আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকসি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মুদ্রিত
Printed and Published by Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat at Ahmadiyya Art Press,
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211